বঙ্গগৌরব

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—০:০:০—

বুদ্ধের জীবন ও বাণী, ভারতীয় সাধক, শিখ-গুরু ও
শিখজাতি, শিবাজী ও মারাঠাজাতি, চরিত্র,
নূতন সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীশরৎকুমার রায়-প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় বি, এ

১৬নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৯২১

সর্ব্বস্বত্বরক্ষিত]

[মূল্য আট আনা

প্রিণ্টার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।

মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
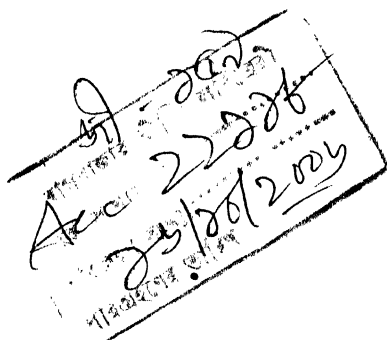
প্রাপ্তিস্থান

গুপ্ত-ব্রাদার্স—১৬নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,

ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস—২২।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

অরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী—২৫।২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

যৎ করোষি যদশ্নাসি

যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয়

তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা

বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ ।

করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ

নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

উৎসর্গ

যাঁহার চরিত্র-সৌরভ

শুভ্র শেফালির সুগন্ধের মত ছাত্রদিগকে আমোদিত করে,

যিনি পরমভাগবত, যিনি পরমভক্ত

আমার সেই পরম পূজনীয়

সচ্চরিত্র সুশিক্ষক

শ্রীযুক্ত জগদ্দীশ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে

এই মনোহর চরিতমাল্য ভক্তিসহকারে

নিবেদিত হইল।

কেশব-নিকেতন,
কলিকাতা,
১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৮

ভক্তি-প্রণত
শ্রীশরৎকুমার রায়

নিবেদন

এই গ্রন্থে বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী বিবৃত হইল। স্কটিশ চর্চ্চ কলেজ পত্রিকায় রায়-বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রকাশিত "গুরুদাস-জননী" প্রবন্ধ এবং প্রবাসী ও অপর কতিপয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিবরণ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গুরুদাসের শিক্ষা-প্রণালী ও সামাজিক মত তৎপ্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছি। আমি পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ-লেখক ও পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়দের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গুরুদাসের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, এবং চৈতন্যলাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় কোন কোন তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

নিবেদক—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বঙ্গগৌরব

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রস্তাবনা

বঙ্গজননী যে-সকল কুলপাবন সুপুত্রের প্রসূতি বলিয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহাদের অন্যতম। চির-প্রসন্ন, অমায়িক গুরুদাসকে যিনি একবারও দেখিয়াছেন তিনি তাঁহার হাস্য-সুন্দর মূর্ত্তি ও স্বভাব-সুলভ সৌজন্য কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার কলঙ্কের রেখামাত্র পাত হইতে পারে নাই বলিয়া বালবৃদ্ধ নরনারী সকলে তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিত। এমন বিশুদ্ধ-চরিত্র ব্যক্তি সকলদেশেই দুর্ল্লভ। চরিত্রবান্ গুরুদাস চিরকাল বঙ্গবাসীর হৃদয়-মন্দিরে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্যব্যপদেশে অল্প কয়বার স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থকারকে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে মনে হইত যেন এক শিশু-স্বভাব ঋষির সহিত কথা কহিতেছি। তাঁহার মুখে যেন কি এক স্বর্গীয় পবিত্রতা মাখান ছিল, তাঁহার বাক্য মধুময় ছিল; তিনি এমন পরমাত্মীয়ের মত আমার সহিত কথা কহিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক দিনই চলিয়া আসিবার সময়ে মনে হইত, আমার এক চিরপরিচিত পরমসুহৃদকে ছাড়িয়া যাইতেছি। তাঁহার চরিত্রে এমনই এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাঁহার কাছ হইতে চলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না।

গুরুদাস আইনের ব্যবসায়ী ছিলেন। এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থলোভে অনেকে ধর্ম্মবোধ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। কিন্তু ধার্ম্মিক গুরুদাস এই ব্যবসায়ে চিরদিন,তাঁহার উজ্জ্বল ধর্ম্ম-বুদ্ধির অনুশাসন মানিয়া

চলিয়াছেন। এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে, গুরুদাস সর্ব্বদা গীতা সঙ্গে লইয়া চলিতেন। এই উক্তির যাথার্থ্যে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, গুরুদাসের জীবনে গীতার শিক্ষা যেমন প্রতিফলিত হইয়াছিল, অতি অল্পজীবনেই এমন দেখা যায়। গুরুদাস চিরকাল গীতা পাঠ করিয়াছেন, অন্তিম শয্যায় গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই তিনি অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রের পুণ্যপ্রভার তুল্য কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও বিস্ময়কর। সাধারণ মানুষ যেমন আপনার সুখ-শান্তির চিন্তায় এমন বিব্রত থাকে যে তাহার পরের কথা ভাবিবার অবসর হয় না; ধর্ম্মপ্রাণ গুরুদাস কেমন করিয়া ঐরূপ আত্ম-সুখ-পরায়ণ হইবেন? বাল্যাবধি লোক-কল্যাণ তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল; বৃদ্ধবয়সে যখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন আপনার সকল শক্তি সমর্পণ করিয়া দিবারাত্র দেশের ও সমাজের সেবা করিতেন। কলিকাতা নগরের বহুসংখ্যক লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। যেখানে তিনি আহূত হইতেন সেই খানেই তিনি গমন করিয়া স্বীয় ধীর ও মূল্যবান্ মত ব্যক্ত করিতেন। বাল-বৃদ্ধ সকলেই অসঙ্কোচে ছোট বড় সকল সভায় তাঁহাকে আহ্বান করিত। এমন শত শত সভায় গুরুদাসকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। গুরুদাস বালকদের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচনার সরসতা বাড়াইয়া দিতেন, যুবকগণ তাঁহাকে অকৃত্রিম উৎসাহী বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার সদুপদেশ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইত, বৃদ্ধদের সভায় স্থির গুরুদাস সুচিন্তিত ও সুযুক্তি-পূর্ণ উপদেশ দ্বারা আলোচনার গাম্ভীর্য্য ও যুক্তিবত্তা বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

গুরুদাসের চরিত্রে কমনীয় সদ্‌গুণরাজির সহিত তেজস্বিতার সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রিয়ভাষী গুরুদাস কর্ত্তব্যবোধে অপ্রিয় সত্যভাষণে

বিরত হইতেন না। একদিন এক সভায় ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি বাগ্মী লর্ড কর্জ্জন ভারতীয় চিকিৎসা-প্রণালীর নিন্দাঘোষণা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় স্যর গুরুদাস উপস্থিত ছিলেন, তিনি রাজপ্রতিনিধির অর্ব্বাচীন উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অসামান্য অভ্যুদয় হইয়াছিল।

লর্ড কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন-জন্য এক কমিটি স্থাপন করিয়াছিলেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিটির সভ্যগণ যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, গুরুদাস সেই সমস্তের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই। তিনি অসঙ্কোচে স্বীয় বিরুদ্ধ-মত ব্যক্ত করিয়া তাহা স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। সহযোগীদের কিংবা কর্ত্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত গুরুদাস স্বীয় স্বাধীন মত প্রকাশে বিরত হইয়া কদাচ দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করেন নাই।

গুরুদাস গীতার ভক্ত, গীতা তাঁহার চিরসঙ্গী এবং চরিত্রের নিয়ামক ছিল। তাঁহার জীবনবীণায় যে রাগিণী নিরন্তর ধ্বনিত হইত তাহা গীতারই শিক্ষা। "সকল কর্ম্মের ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে লোকসেবা কর"—ইহাই ধর্ম্মপ্রাণ গুরুদাসের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বালবৃদ্ধ নরনারী যে-কেহ যে-কোন প্রকার বিপদে পড়িয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি অকাতরচিত্তে তাহাকে স্বীয় সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার দ্বারে কদাচ ভিখারী বিমুখ হইত না। শত শত বিদ্যার্থী গুরুদাসের নিকট অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইত। তাঁহার এই আড়ম্বর-শূন্য বদান্যতার বিবরণ সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইত না সুতরাং তাঁহার এই দানের যথার্থ বিবরণ অনেকেই জ্ঞাত নহেন।

গুরুদাস আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, প্রাচীন ভারত অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভের সাধনায় স্বীয় শক্তি এমন ভাবে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিলেন যে, এই দেশে বাহ্য সম্পদ্ লাভের চেষ্টা উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—ভারতবর্ষকে এখন অন্তর ও বাহির এই দ্বিবিধ সম্পদ লাভের সাধনায় সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। এই সামঞ্জস্যের উপরই ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি নির্ভর করে।

বঙ্গগৌরব

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

মাতাপিতা

ইংরাজী ১৮৪৪ অব্দের ২৬এ জানুয়ারী কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে গুরুদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। শিশু পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই পণ্ডিত পিতা গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। শিশুর কর্ণে সেই ছন্দোময়ী বাণী প্রবেশ করিয়া হয়ত আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিত কিন্তু তাহার কোন অর্থবোধ হইত না ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক ধার্ম্মিক পিতার এই গীতার প্রতি অনুরক্তি পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাহার জীবনের উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অতি শিশু বয়সেই গুরুদাস পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সুযোগ্য পুত্রের বিদ্যাগৌরব, পদগৌরব এবং আর্থিক উন্নতি দর্শনের অবসর পান নাই।

জননী

ভাগ্যবান্ গুরুদাস এক অসামান্যা নারীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-গঠনে এই ধর্ম্মানুরাগিণী তেজস্বিনী মহিলা যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। সন্তানের দেহ ও মনের পুষ্টিসাধনে জননীই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সহায়। আমাদের দেশের জননীগণ শিক্ষার অভাব হেতু উহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। জননীর সহিত খেলিতে খেলিতে সন্তান মাতার ভাষায় বাক্যালাপ শিক্ষা করে। বুদ্ধিমতী জননীর সাহায্যেই পৃথিবীর সহিত সন্তানের প্রথম পরিচয় হয়। ভিত্তির প্রথম প্রস্তরখণ্ড অবলম্বন করিয়া, যেমন বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মাতৃদত্ত শৈশব-শিক্ষার উপর মানবের যাবতীয় ভবিষ্যৎশিক্ষা নির্ভর করে। এইরূপ কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু মাতৃজঠরে অবস্থান কালে চক্রব্যূহ প্রবেশ-আখ্যান শুনিয়া উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন যখন নিষ্ক্রমণ বর্ণনা করেন তখন জননী সুভদ্রা নিদ্রাভিভূতা হইয়াছিলেন তজ্জন্য জঠরস্থ শিশু নিষ্ক্রমণের কৌশল শুনিতে পান নাই। এই পৌরাণিক আখ্যান মধ্যে এই মহৎ সত্য নিহিত আছে যে, জননীর রক্ত যেমন সন্তানের দেহ গঠন করে তাহার মনদ্বারা তেমন সন্তানের মন গঠিত হইয়া থাকে।

গুরুদাসের জননী সেকালের আদর্শ হিন্দুনারী ছিলেন, তিনি সকল কার্য্যে পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে জানিতেন। শৈশবেই গুরুদাস পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার জননীও স্বামীর মৃত্যুতে অসহায়া ও বিপন্না হইলেও শোকের সেই প্রচণ্ড আঘাতে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন না। ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না, কোনরূপে

অন্ন সংস্থান হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, এই দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা দান করিবেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশের এক নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণমহিলা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এমনভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তিনি অভাবের পীড়ন সহ্য করিয়াও স্বীয় পুত্রকে ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

১৩২০ সালের ভাদ্র-সংখ্যক "ভারতবর্ষে" পরলোকগত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "গুরুদাস-জননী" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

স্যর গুরুদাসের পিতামহ কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল হইতে নারিকেলডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। স্যর গুরুদাসের পিতৃদেব ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত "কার ঠাকুর কোম্পানী"র আফিসে রামচন্দ্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনা পূজা-আহ্নিকে একটু বেলা হইত, সুতরাং আফিসে উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব হইত। অন্য কর্ম্মচারীদের বিলম্ব হইলে তিরস্কৃত হইতে হইত, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিত না। এ বিষয় লইয়া অন্যান্য লোক যখন কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও প্রতিকার-পরায়ণ হইলেন; কিন্তু এই নিষ্ঠাবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীটিকে তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া "হাজিরা বহি" খানির ভার তাঁহার উপর দিলেন। সকলের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার উপর দৃষ্টি রাখিতে গিয়া তিনি আপনা হইতেই ঠিক্ সময়ে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন।

অল্পবয়সে তাঁহার লোকান্তর-গমন-জন্য স্যর গুরুদাসের পিতৃগৃহে দৈন্যদশার সংঘটন হয়। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের আফিস হইতে পেন্‌সন্‌ হিসাবে মাস মাস কিছু টাকা মঞ্জুর করিবেন, এমন সময়ে নানা বিপৎপাতে আফিস উঠিয়া গেল। সে সাহায্যদানের আর সুবিধা ঘটে নাই। এই অকাল-মৃত্যু নিবন্ধন গুরুদাসের পিতৃপরিবার তাঁহার বাল্যাবস্থায় দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

স্যর গুরুদাসের মাতৃদেবী অধ্যাপকবংশসম্ভূতা। শোভাবাজার নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়বাচস্পতি বাস করিতেন। তিনি প্রতিষ্ঠাবান্‌ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারই চতুর্থা কন্যা সোনামণি দেবীর সহিত রামচন্দ্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অধ্যাপক-কন্যা সোনামণি দেবীই স্যর গুরুদাসের জননী। কলিকাতায় বাস হইলেও বাচস্পতি মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বার-মাসে তের-পার্ব্বণ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত। এখনকারমত শিথিল-ভাব তখনও দেখা দেয় নাই; সুতরাং বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রচুর ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রামমণি স্বামীর অনুমৃতা হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা হইয়া এবং এই হিন্দু-গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দেখিয়া গুরুদাসের মাতৃদেবী নিজচরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। বাচস্পতি ও তদীয় পরিবারে লালিত পালিত কন্যা সোনামণি অশূদ্র-পরিগ্রাহী ছিলেন; এইজন্য লোভ-সংবরণ-শিক্ষা প্রথমাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। লোভশূন্যতাই গুরুদাস-জননীর সকল শিক্ষার মেরুদণ্ডরূপ হইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই স্যর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স তুই বৎসর দশ মাস। সুতরাং পুত্রের

লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান বিষয়ে স্যর গুরুদাসের জননী একাকিনীই পিতৃমাতৃ-কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর সে সময়ে সেই স্বচ্ছলতার দিনেও ঐ ক্ষুদ্র সংসারের অভাব অনটন যথেষ্ট ছিল। নিঃসম্বল ক্ষুদ্র হিন্দু সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্যের রুক্ষদৃষ্টি যেরূপ স্বাভাবিক, স্যর গুরুদাসের মাতৃগৃহে তাহার অভাব ছিল না।

এইরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হইয়াও, এই এক পুত্র লইয়া অল্প বয়সে বৈধব্য ও তজ্জাত শত ক্লেশ ও অসুবিধা মস্তকে ধারণ করিয়া, তিনি পুত্রটির প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিলেন। কিরূপভাবে ছেলেটীকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, এই একমাত্র চিন্তা তখন তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সেই সময়ের কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করি; তাহা হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই বাঙ্গালী মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-পারাবার কিরূপ দৃঢ় বেষ্টনীদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

স্যর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগের পর, বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই যে আমের সময়, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস, আসিল, তখন তিনি সমগ্র জ্যৈষ্ঠমাস ব্যাপিয়া দুই বেলা দুটা, কোন দিন বেশীও, আম খাইতে পাইয়াছেন। ১লা আষাঢ় তারিখে আহারের সময় আম চাহিবামাত্র তাঁহার মাতৃদেবী বলিলেন, "আজ আর আম খায় না; আম জ্যৈষ্ঠ মাসেই খায়, আষাঢ় মাসে আম খায় না, তুমিও খেয়ো না।" গুরুদাস আমের জন্য আবদার ধরিলেন, আম না হইলে ভাত খাইবেন না। শেষে কান্নাকাটি ব্যাপার, জননী কিছুতেই আম দিবেন না; গুরুদাসের সম্পর্কে এক ভাগিনেয় সেখানে বসিয়াই আম খাইতেছে, তিনি তাহা দেখিয়া নিজের আম পাইবার অধিকার প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। গুরুদাসের পিতামহী

নিতান্ত কাতরা হইয়া বালকের আবদার পূরণের জন্য বধূমাতাকে বলিলেন, "দাও না, ঘরে আছে দাও,—যখন না থাকিবে তখন না দিও।" বধূমাতা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অতি মিষ্টভাবে সসম্মানে বলিলেন, "এই বায়নার উপর আম দিলেই দিন দিন ভয়ানক আব্দারে হয়ে উঠ্‌বে, তখন কোথায় পাব? আজ দিব না, কাল দিব, না হয় বিকালে দিব, কিন্তু এখন দিব না।" তাহাকে তখন বিনা আমেই ভাত খাইতে হইল। তৎপরে অপরাহ্নে আম পাইয়া আনন্দ আর ধরে না।

স্যর গুরুদাসের জননী অনেক সময়ে পুত্রের সঙ্গে খেলা করিতেন। বাল্যকালে তাঁহার বাটীর বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না। একাধিক প্রতি-বেশী বালক বাড়ীতে আসিয়া গুরুদাসের সঙ্গে খেলা করিলে তিনি আপত্তি করিতেন না, কারণ, নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বালকের প্রতি স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন। কোন প্রকারে নিজের অভিপ্রেত পথের বাহিরে যাইতে দিতেন না। কোন প্রকার অপ্রিয় সংঘটন, কলহ ইত্যাদির সুযোগ ঘটিত না। মায়ের বিনানুমতিতে বাড়ীর বাহিরে যাইবার অধিকার ছিল না এবং মায়ের অজ্ঞাতসারে গুরুদাস সে অধিকার প্রায় কখনও গ্রহণ করিতেন না। এবিষয়ে মাতাপুত্র উভয়েরই গুণপনার উত্তম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মাতা কেমন সুন্দর উপায়ে পুত্রটিকে বাল্যকালে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে আপন বশে রাখিয়াছিলেন, আবার পুত্রও এই বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বাভিমানের দিনে, কেমন সহজে মাতৃ-আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন, বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে ইহা উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

অনেক স্থলে পিতামহী, মাতামহী, বিধবা পিতৃষস্বগণের স্নেহ-প্রাবল্যে মাতৃশক্তি কার্য্যকরী হয় না। এক্ষেত্রে গুরুদাসের পিতামহী তাঁহার বধূমাতার পুত্রপালন-পদ্ধতি অবলোকন করিয়া এরূপ

বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও "খোদার উপর খোদ্‌কারি" করিতে যাইতেন না। অবশ্য এটা হয় ত স্তর গুরুদাসের শুভগ্রহের ফল বলিতে হইবে, কারণ অনেক স্থলেই প্রবীণা গুরুজনের অসাবধানতায় মাতৃশক্তি উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পায় না; এবিষয়ে গুরুদাসের পিতামহী দেবী ভিন্ন-প্রকৃতির ছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাসের অতি কোমল ও নম্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া নারিকেল-ডাঙ্গার পল্লীসমাজ তাঁহার মাতৃদেবীকেই প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র-পালন-পদ্ধতি প্রতিবেশিনী মহিলা মহালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। পাড়ায় কেহ পুত্র কন্যা লইয়া বিব্রত ও বিপন্ন হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই দ্বারস্থ হইত। তিনিও সর্ব্বদাই অতি সহজে তাঁহার কোমল-কঠোর নীতি প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুরন্ত বালক বালিকাকে শান্ত করিয়া দিতেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ঐরূপ অশিষ্ট বালক বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া কিছু আহার দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহার আবদার বা রাগের কারণ জানিয়া লইতেন; পরে, স্থল-বিশেষে তাহার আত্মীয় স্বজনকে দু একটা মিষ্ট ভৎ'সনা করিয়া, শেষে তাহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার দৌরাত্ম্য ও বেয়াদবি বুঝাইয়া দিতেন, তখন সে ত্বরায় নিজের দোষ স্বীকার করিয়া শান্তভাব ধারণ করিত।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে এই দেবী-স্বভাবা নারী নানা-কারণে প্রচুর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। স্তর গুরুদাসের অকপট, নির্ম্মল ও সৌজন্যপূর্ণ মিষ্ট-ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে নিকটবর্ত্তী জনমণ্ডলী-মধ্যে পূজার পাত্রী করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সাধু ব্যবহারে অন্তরালে লোকে তাঁহার সাধ্বী ও পূতকর্ম্মানুরাগিণী জননীর নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের আভাস অনুভব করিয়া থাকে।

হিন্দুমহিলা শ্বশুর কুলের নাম রক্ষার জন্য যেমন লালায়িত, শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ দেওয়াও তেমনই গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। গুরুদাস জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হইয়া যখন বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, তখন তাঁহার মাতা অনিচ্ছাপূর্ব্বক সকলকে লইয়া পুত্রের সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই নারিকেল-ডাঙ্গাটি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত। সর্ব্বদাই বলিতেন, "সামান্য কিছু করিয়া লও, পরে চল বাড়ী যাই ; বাড়ীতে থেকে ক্লেশ পাই সেও ভাল। এখানে কেন থাকিবে ?" নিয়ত মায়ের এই ইচ্ছা শুনিতে শুনিতে স্যর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিলেন। মাতৃ-আদেশে পুনরায় নারিকেল-ডাঙ্গার বাটীতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হাইকোর্টের জজ হইবার পর বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাড়ী করিয়া বা ভাড়া লইয়া, বাঁস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে পরামর্শ মাতা-পুত্র উভয়ের—কাহারই মনঃপুত হয় নাই। দুর্দ্দিনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নারিকেল-ডাঙ্গার বাসভবন গুরুদাসের জননীর বড়ই প্রিয়-স্থান ছিল। তিনি এই স্থানটিকে জীবন-সংগ্রামের তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিতেন।

স্যর গুরুদাসের বাল্যাবস্থায় রন্ধনের জন্য তাঁহার বাটীতে গোল-পাতার একখানি ঘর ছিল। ঐ পাকশালার অতি নিকটে একপার্শ্বে একটি কাগ্‌জি লেবুর গাছ ছিল, ঐ গাছটিতে এত লেবু হইত যে, পাড়ার লোক, দাসদাসী মুটে মজুর, যাহার যখন প্রয়োজন হইত চাহিবা মাত্র লেবু পাইত। গাছটিতে এত ফল ধরিত যে, লেবু পুষ্ট হইবার সময় গাছটিকে আসন্ন-প্রসবা গর্ভিণীর ন্যায় অবসন্ন ও ফলভার-বিপন্ন বলিয়া বোধ হইত। সেই সময় প্রতিবেশিগণের বাৎসরিক প্রাপ্য বিতরিত

হইত ;—সে বিতরণে পাড়ার এক প্রাণীও বাদ পড়িত না। এইরূপ সময়ে একদা এক মুটিয়া, কাঠের মোট নামাইয়া পারিশ্রমিক লইবার সময়ে লেবু গাছের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, মা ঠাকুরাণীর নিকট অতি ব্যাকুল-ভাবে একটি লেবু চাহিয়াছিল। তাঁহার কোন সময়েই ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্তে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি সম্পন্ন করিতেন, কেবল কখন কখন গুরুদাসের বাল্যব্যবহারে বিরক্তির কারণ ঘটিলেই তিনি কাতর ও বিরক্ত হইয়া পড়িতেন। মাতাঠাকুরাণী তখন ঐরূপ ঘটনায় চিত্তচাঞ্চল্য ভোগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মুটিয়া লেবু চাহিয়াছে ; তাই রুক্ষ ভাবে বিরক্তির স্বরে তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন "কেন?—যে আস্‌বে, যার দরকার, সেই লেবু চাহিবে কেন? না,—লেবু পাবে না" লোকটা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে প্রাপ্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। অল্পকাল-পরেই ঠাকুরাণীর বিরক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মুটিয়ার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল,—তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। গুরুদাসের মাতৃদেবীর মানসিক গ্লানি ও অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে দিন গেল, পরদিন গেল, কিন্তু উঠিতে বসিতে "লোকটাকে লেবু দেওয়া হইল না" এই কয়টি বাক্য সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে কি অশান্তি! এইরূপে কএকদিন কাটিয়া গেলে, এক-দিন পুত্রকে বলিলেন—"খালধারে যেখান হইতে আমাদের কাঠ আসে স্কুল থেকে আসিবার সময় সেইখানে লোকটির সন্ধান লইও, পাইলে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে, তাহাকে লেবু না দিয়া আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।" মাতৃদেবীর এইরূপ আত্মগ্লানি, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের সুবিমল প্রভাব যে গুরুদাসের বাল্য-জীবন গঠনের পরিপোষক—ঐ মায়ের সুবুদ্ধিপ্রসূত বিবিধ-উপকরণ যে জীবন-গঠনের উপাদানরূপে

নিয়োজিত হইয়াছিল সে জীবন উত্তরকালে যে সমগ্র জন-সমাজকে মোহিত করিবে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? স্যর গুরুদাসকে ঠেকিয়া শিখিতে হয় নাই। মাতৃ-স্নেহের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া মাতৃ-জীবনের ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার, সৌজন্য ও শীলতাই তাঁহার বেদ-বাইবেল-কোরাণে পরিণত হইয়াছিল;—তিনি মাতাকে দেখিতে দেখিতে নিজে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন!

স্যর গুরুদাসের শৈশব, বাল্য, ও প্রথম যৌবনকাল এইরূপে মায়ের উপদেশ ও সস্নেহশাসনে পবিত্রভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছিল; গৃহের বাহিরে কখনও জলস্পর্শের প্রয়োজন হয় নাই। বাল্যকাল হইতে এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনে—বোধ হয় পঠদ্দশায়—মোটের উপর দুই-তিন-দিন বিদ্যালয়ে মিষ্টান্নভক্ষণ ও পিপাসার জল পান করিয়াছিলেন। তাহাও জননী জানিতে পারিয়া আপত্তি করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রবীণা গৃহিণীর সংসার-ধর্ম্ম পালনের ফলে, আজ পর্য্যন্ত স্যর গুরুদাসের পুত্র-পৌত্রগণ এই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। পারিবারিক জীবনে এরূপ বিচিত্র নিষ্ঠা এদেশে আরও অনেক আছে কি না বলিতে পারি না। প্রবেশিকার সময়ে গুরুদাস জ্বরে খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষ বহু যত্নে পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহাকে জ্বর-মুক্ত করেন। ইংরেজী পরীক্ষার দিনেও গুরুদাস পথ্য পান নাই। এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার সন্দেহ নাই! কিন্তু যাঁহার দীর্ঘজীবনে বার মাসের নিত্য-আহার প্রায় একাদশীর কাছাকাছি, তাঁহার পক্ষে জ্বরের পর উপবাসে ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে যাওয়া ও পরীক্ষায় প্রথম হওয়া বেশী বিচিত্র ব্যাপার নাও হইতে পারে। এই পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট

ফললাভের জন্য গুরুদাস ও তদীয় মাতৃদেবী ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষের নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইহার পরে একবার সরস্বতী পূজার সময়ে মাতার আদেশমত ডাক্তার বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যায়;—পুত্রের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া জননী অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক পদশব্দে গুরুদাসের বাটী-প্রত্যাবর্ত্তন কল্পনা করিয়া, পরে নিরাশ হইয়া উৎকণ্ঠার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। রাত্রি আটঘটিকার পর গুরুদাস গৃহে আসিবামাত্র মাতা পুত্রকে বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গুরুদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু আমাকে পূজার আরতি হওয়া পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিলেন,—আমি কি করিব?" মাতা বলিলেন, "তুমি তাঁকে কেন বলিলে না যে মা বিরক্ত হইবেন?" পুত্র বলিলেন, "আমি কি অন্যের নিকট 'মা বিরক্ত হইবেন',—এ কথা বলিতে পারি?" পুত্রের এই সুবিবেচনা-সঙ্গত-বাক্যে মায়ের বিরক্তির বিরতি হইল;—আর কিছুই বলিলেন না। গুরুদাসের বাল্য-জীবনে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটে নাই!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—লোভশূন্যতা এই পরিবারের প্রধান অলঙ্কার —লোভ না থাকিলে মানুষ প্রতিযোগিতার প্রেরণায় জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু স্যর গুরুদাসের জননী সর্ব্বদাই পুত্রকে লোভের অধীন হইয়া বিদ্যা-অর্জ্জনে অত্যধিক বাধা দিয়া বলিতেন, "বেশী খাটাখুটি, বেশী বাড়াবাড়ি, কিছুই ভাল নহে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ শ্রম-সহকারে পড়াশুনা কর,—ফললাভ তোমার হাতে নাই;— বেশী খাট্‌লেই যে উত্তম ফল ফলিবে, তা মনেও ক'রো না, ফলদাতা বিধাতা উপযুক্ত সময়ে যোগ্য পাত্রে উপযুক্ত ফল বিধান করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া মাতা সর্ব্বদাই পুত্রের অধিক শ্রমে বাধা দিতেন। স্যর

গুরুদাসও হৃষ্টচিত্তে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও প্রথম যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মপটুতা কোথায় যাইবে? বি, এল পরীক্ষার সময় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার জন্য ও মেডেল পাইবার জন্য বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন;—পাইকপাড়ার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্যর গুরুদাসের দূর সম্পর্কে ভাই হন, তিনি ঐ সময়ে তাঁহাদের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তিনি একদিন বলিতে-ছিলেন, "সবকটা পরীক্ষায় দাদা সকলের উপরে হইয়াছে, এইটা হইলেই হয়!—এতে আবার একখানা সোনার পদক দেয় কি না!" গুরুদাসের জননী জানিতে পারিয়া ত্বরায় নিকটে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এরূপ জয়লাভের বাসনা মনে স্থান দিও না। তা'তে ধর্ম্মহানি হইবে,—ওটা প্রশস্ত পথ নহে। তুমি পাশ হইলেই আমি সুখী হইব।" প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ও গুণবান্ ও কর্ম্মপটু হইয়াও গুরুদাসকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই শুনিয়া, এবং এবার তাঁহারই সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলিবে, গুরুদাস-জননী এই কথা শুনিয়া, হর্ষ-বিমিশ্রিত কাতরস্বরে বলিলেন, —"আহা! এবার নীলাম্বর যেন সোনার পদক পায়,—তুমি পাশ হইলেই আমি খুসী হইব।" কিন্তু কার্য্যতঃ স্যর গুরুদাস মাতৃআজ্ঞা রক্ষা করিতে এবং মাতৃ-ইচ্ছা পালন করিতে পারেন নাই! নীলাম্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া, সোনার পদক লইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া-ছিলেন। জানি না, এইরূপ মাতৃ-ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতে না পারায় গুরুদাসের কোন অপরাধ হইয়াছিল কি না! তাঁহার মাতা কিন্তু সে দিন ফল-কামনার বিরুদ্ধে গীতা-সঙ্গত সদুপদেশ-দ্বারা পুত্রের হৃদয় হইতে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আশার পথে প্রধাবিত হওয়া যে অত্যন্ত অন্যায়,

এবং তাহাতে যে চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস দীর্ঘ-জীবনে মাতৃ আদর্শে এরূপ নিরীহ প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন যে, ছাত্র-জীবনে অমিত গৌরব, পরবর্ত্তী জীবনে বহু অর্থ ও মান-সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়াও কোথাও কখনও—কোনও কারণে আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেন নাই এবং পদমর্য্যাদার প্রতাপে কখনও কোন কার্য্যোদ্ধারের প্রয়াস পান নাই।

স্যর গুরুদাসের গৃহস্থ-জীবন যখন বিধাতার কৃপায় বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল,—ক্রমশঃ পুত্র কন্যা ও পরিজনবর্গে যখন গৃহ পূর্ণ হইতে লাগিল,—তখন সেই প্রাচীনা বৃদ্ধা জননী ষষ্ঠি বুড়ীর ন্যায় বহু নাতি নাতিনী লইয়া সুখে কালযাপন করিতেন! তখনও সকলকে আপনবশে রাখিয়া আপনার শাসননীতি প্রয়োগ করিয়া সকলকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সময় সময় গৃহের শিশুরা জননীদের নিকট দৌরাত্ম্যনিবন্ধন প্রহার পুরস্কার পাইলে বৃদ্ধা বলিতেন—

"ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,
নিজের ক্ষতি নিজে করে।"

তিনি বালক বালিকাদিগকে প্রহার করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—স্নেহ মমতা ও মিষ্ট কথায় যত কাজ হয়, কঠোর ব্যবহারে তাহা হয় না। তাই তিনি শিশুদিগের উপর কখনও কঠোর ব্যবহার করিতেন না, কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে ক্ষুণ্ণ হইতেন। স্যর গুরুদাসের মাতৃদেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের শিশুপালননীতি-বিবরণ কখনও অবগত ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবগুণে আপনা আপনি সেগুলি তাঁহার উচ্চ চরিত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। বধূমাতাদের কেহ কখন পুত্রকন্যাকে শাসনকালে "মেরে

হাড় গুঁড়ো করে দেব” বলিলে তিনি বলিতেন, “কখনও অমন অন্যায় ও অসত্য কথা বলিও না। তুমিত ওর একখানি হাড়ও ভাঙ্গিবে না, তবে বল কেন? ছেলের কাছে তোমার কথার মর্য্যাদা থাকিবে না! এতেই মিথ্যা বলার অভ্যাস প্রবল হইয়া পরিবে!—নানা রকমে অনিষ্ট হইবে! যাহা করিবে না, তাহা বলিও না।”

স্যর গুরুদাসের জননী শেষ বয়সে সর্ব্বদাই অপরাহ্ণে জ্যেষ্ঠ পৌত্র হারাণ চন্দ্রের নিকট বসিয়া গীতা-পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া হারাণ বাবুর নিকট কোন কোন বিষয় বুঝিয়া লইতেন। হারাণ বাবুও আনন্দে ঠাকুরমায়ের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্ম চর্চ্চার সহায়তা করিতেন।

একদা প্রসঙ্গক্রমে হারাণ বাবু বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর মা! তোমার গীতাশ্রবণের প্রয়োজন কি? তুমি যেভাবে জীবন যাপন করিলে, এইত গীতা! গীতায় যাহা আছে, তোমাতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই! আমরা বাড়ীতেই জীবন্ত গীতা দেখিতে পাইতেছি!” ঠাকুরমা পৌত্রের এতাদৃশ সমাদর প্রদর্শনে নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “ছি, ছি, অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? ও সব দেবতার কথা,—দেবতার লীলা মানুষে কখন সম্ভব হয় না। অমন কথা বলিতে নাই!”

দ্বিতীয় অধ্যায়

—•:•:•—

বিদ্যার্থী গুরুদাস—ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ

জেনারেল এসেম্ব্লি-বিদ্যালয়ে গুরুদাসের ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়ে তিনি অধিক দিন অধ্যয়ন করেন নাই। এই সময়ে কলিকাতা নগরের উত্তরাঞ্চলস্থ বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে অরিয়েণ্টাল-সেমিনেরি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। গুরুদাস তাঁহার সমৃদ্ধ ও পদস্থ মাতুলের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তখন উহা গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে গুরুদাস সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক রিচার্ডসন সাহেবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। নব্যবঙ্গের প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের অনেকেই এই বিদেশীয় সহৃদয় শিক্ষক মহোদয়ের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানার্জ্জনের অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাতুলের ইচ্ছা ছিল গুরুদাস তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন, কিন্তু জননী উহাতে বিরোধী হইলেন। স্বধর্ম্মের প্রতি গুরুদাসের অনুরাগ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য গুরুদাসকে অরিয়েণ্টাল সেমিনেরী ত্যাগ করিতে হইল, কারণ নারিকেলডাঙ্গার বাড়ী হইতে উক্ত বিদ্যালয় বহু দূরে অবস্থিত। গুরুদাস হেয়ারস্কুলে

প্রবেশ করিলেন। তখন ঐ বিদ্যালয় আধুনিক প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল, তখন উহার নাম ছিল কলুটোলা-শাখা-বিদ্যালয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস হেয়ার স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তাহার অধ্যয়ন-অনুরাগ অসামান্য ছিল। হেয়ার স্কুলে তিনি ৫ বৎসরে ৮ শ্রেণীর পাঠ অধ্যয়ন করেন। প্রত্যেক শ্রেণীতেই বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন।

শিক্ষক প্যারিচরণ

বিদ্যার্থী গুরুদাস যখন হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন তখন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সুশিক্ষক প্রতিভাশালী প্যারিচরণ সরকার মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠে যেমন বঙ্গীয় বালকগণের বর্ণ পরিচয় হইয়া থাকে, ইংরাজী প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত প্যারিচরণের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ইংরাজী-পাঠ তেমনই আদৃত হইয়া থাকে। শিক্ষকতা কার্য্যে প্যারিচরণ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তার আরনল্ডের সহিত তুলনা করিয়া পূর্ব্ব দেশীয় আরনল্ড্ বলা হইয়া থাকে। সুশিক্ষকের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি স্বীয় জ্ঞান-বর্ত্তিকাসংযোগে ছাত্রের হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জনের অনুরাগ প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারেন। প্যারিচরণ আপনার ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এই আড়ম্বরশূন্য সরল-স্বভাব শিক্ষকের প্রভাব গুরুদাসের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানপ্রস্রবণের বারি আকণ্ঠ পান করিয়াও তিনি আচার ব্যবহারে প্রাচ্য সারল্য রক্ষা করিয়াছিলেন ; গৃহে পুণ্যবতী জননী এবং

Acc 22228
28/11/2006

বিদ্যালয়ে সুশিক্ষক প্যারিচরণের তুল্য চরিত্রবান্ মহাত্মার নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই গুরুদাস এমন আড়ম্বরহীন সরল নির্দ্দোষ চরিত্র লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুদাস তাঁহার শিক্ষক প্যারিচরণের শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তিনি প্রত্যেক দিনের পাঠ হইতে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর ছাত্রদিগকে লিখিতে দিতেন, অতি সতর্কতার সহিত প্রত্যেক ছাত্রের লিখিত উত্তর সংশোধন করিতেন, এবং অধ্যাপনাকালে প্রত্যেক ছাত্রের ভুল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ইহাতে অতি সুফল পাওয়া যাইত। প্রত্যেক ছাত্র যেমন স্ব স্ব ভুল সংশোধনের সুযোগ পাইত, তেমন ছাত্রেরা সাধারণতঃ কিরূপ-ভাবে ভুল করিয়া থাকে উহাও জানিতে পাইয়া উপ-কৃত হইত। প্যারিচরণ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন তখন তিনি এই প্রণালীক্রমে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন।

প্যারিচরণের জ্ঞানানুরাগ ও অধ্যাপনাবৈশিষ্ট্য তদীয় সুযোগ্য ছাত্র গুরুদাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রত্যহ নানারূপ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইত, তখনও গৃহে তিনি প্রত্যেক দিন স্বয়ং পুত্র ও পৌত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। শিক্ষাদান তাঁহার আনন্দের বিষয় ছিল। যথোচিত সুযোগ প্রাপ্ত হইলে তিনি চিরকাল শিক্ষকতাই করিতেন, এই কথা তিনি বহুবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যে ছাত্রে শিক্ষকের উপদেশ সার্থকতা লাভ করে সেই ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। গুরুদাসের প্রতি প্যারি-চরণের তেমনি প্রীতি জন্মিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে সহসা গুরুদাস অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহাতে প্যারিচরণের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি গুরুদাসের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আইসেন এবং তিনি যাহাতে প্রত্যহ পরীক্ষা দিতে আসিতে পারেন

তজ্জন্য উপযুক্ত যান ও বাহকের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। বিদ্যালয়-মধ্যে গুরুদাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, তাঁহার সার্থকতার উপর বিদ্যালয়ের ও শিক্ষকের গৌরব নির্ভর করিত বলিয়া প্যারিচরণ তাহার জন্য বিশেষ চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। গুরুদাসের যখন সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গেল তখন প্যারিচরণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সংস্কৃত শিক্ষা

গুরুদাসের মেধা-শক্তি অসাধারণ ছিল। এইরূপ কথিত হয় যে, মেধা ও মনীষা এই দুই সাধারণতঃ একই ব্যক্তির থাকে না। এই উক্তি গুরুদাস সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে না। বাল্যকালে এক পণ্ডিতের নিকট তিনি সংস্কৃত পাঠ করিতেন, সেই সময়ে তিনি সংস্কৃত অভিধান —"অমর কোষ" কণ্ঠস্থ করেন। ইহাতে উত্তরকালে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। বহরমপুর অবস্থান সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সভাস্থলে বক্তৃতাকালে তিনি তাঁহার পাঠ্যজীবনে অধীত সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী গদ্য ও পদ্য সকল গ্রন্থ হইতে যদৃচ্ছা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। স্মৃতি-শক্তির অনুশীলন করিয়া ছাত্রগণ যাহাতে আবৃত্তি দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। কলিকাতার কলেজ সমূহের ছাত্রগণ-মধ্যে বাৎসরিক আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। গুরুদাস ইহার অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন। ছাত্রগণ কোন্ কবিতা আবৃত্তি করিবে কখন কখন তিনিই তাহা স্থির করিয়া দিতেন।

বাল্যকাল হইতে গুরুদাস ভগবদ্গীতার অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন দুই কি তিন তখন তিনি পিতৃ অঙ্কে থাকিয়া শুনিতেন—

তাঁহার পিতা গীতাপাঠ করিতেছেন। নিষ্ঠাবান্ গুরুদাস প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার পিতার স্বাক্ষরযুক্ত একখানি গীতা হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। গীতা গুরুদাসের চির-সঙ্গী, চির-প্রিয় ও চির-সুহৃদ ছিল। অন্তিমশয্যায় তাঁহার আদেশে তাঁহার এক পুত্র গীতা পাঠ করিতেছিলেন, অবহিতচিত্তে গীতার মধুর বাণী শ্রবণ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কলেজে বিদ্যাশিক্ষা

গুরুদাস একদিকে যেমন তীক্ষ্ণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, অন্যদিকে তেমনই পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল ছিলেন। ইহারই ফলে তিনি স্কুল ও কলেজের সকল শ্রেণীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার কুশাগ্রীয়া-ধী যে কোন বিষয় অতি অল্পায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার তুল্য মনীষা-সম্পন্নের সংখ্যা অধিক নহে। কাশ্মীরের রাজস্ব-সচিব বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ (সলিসিটর) ব্যবহারাজীবী বাবু কালীনাথ মিত্র এবং মাননীয় বিচারপতি বসন্তকুমার মল্লিকের ও ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের পরলোকগত পিতা ব্যবহারাজীবী (এড্ভোকেট) অতুলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সমধিক প্রসিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সমূহে নীলাম্বর বাবু গুরুদাসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পরীক্ষায় গুরুদাস প্রথম এবং নীলাম্বর বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন।

সহাধ্যায়ীর সহিত পরীক্ষায় এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারেও গুরুদাসের ধর্ম্মপরায়ণা জননীর মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুদাস যখন ব্যবহারশাস্ত্রের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার

কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে নীলাম্বর বাবুকে পরাভূত করিয়া সুবর্ণপদক লাভের নিমিত্ত অতিরিক্ত রাত্রিজাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই স্বার্থদুষ্ট প্রতিযোগিতা গুরুদাসের জননীর তুল্য ঈশ্বরপরায়ণা নারীর নিকট কোনক্রমে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তিনি গুরুদাসকে এই প্রতিযোগিতার দোষ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন "সহ-পাঠীকে পরাস্ত করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইবে সেই জন্য আমি তোমাকে অধিক রাত্রিজাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে দিব না। যে সকল বস্তু উৎকৃষ্ট তাহা আমিই যেন পাই, অন্যে যেন পায়না এবম্প্রকার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি অনেক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক পাইয়াছ। এই পরীক্ষায় যদি নীলাম্বর ঐ পদক প্রাপ্ত হন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।" জননী এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, পুত্র যাহাতে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি প্রদীপের তৈলের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, জননীর তৈলের মাত্রা হ্রাস করিয়া দিবার কোন আব-শ্যকতা ছিল না, কারণ মাতৃভক্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গুরুদাসের নিকট জননীর আজ্ঞাই যথেষ্ট ছিল। বিদ্যার্থীদের মধ্যে অধ্যয়নক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সাধারণতঃ দূষণীয় বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। গুরুদাসের জননী যে ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রেরণায় উহার দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন উহা সাধারণ নৈতিক বিধির উর্দ্ধে অবস্থিত। মাতার এই মহোচ্চ নীতি পুত্রের পারিবারিক ও কর্ম্ম-জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে গুরুদাস তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাউয়েল, সাট্‌ক্লিফ, সাউণ্ডার্স, লব, জোন্স, ষ্টিফেন্সন, রিস, প্যারিচরণ সরকার ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সুধীগণের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুদাস যখন দ্বিতীয় বার্ষিক

শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন তখন প্যারিচরণ তাহার ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তখন উৎকৃষ্ট রচনা-লেখক বলিয়া গুরুদাসের খ্যাতি ছিল। ঘটনাক্রমে গুরুদাস একদিন একখণ্ড কদর্য্য কাগজে রচনা লিখিয়াছিলেন। রচনা পরীক্ষান্তে প্যারিচরণ উহার উপরে এই মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—"রচনা উত্তম হইয়াছে কিন্তু কাগজখণ্ড লেখকের ঔদাসীন্যের পরিচায়ক।"

মিঃ রিস গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। জ্যামিতি শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার নিকটে বিভিন্ন গ্রন্থকার প্রণীত সতের প্রকারের জ্যামিতি ছিল বলিয়া তিনি বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেন। ছাত্রদের প্রত্যেকের নিকট কেবল এক প্রকারের জ্যামিতি ছিল। গণিতে গুরুদাসের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি সাত প্রকারের জ্যামিতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গণিতের অধ্যাপক হইলেও মিঃ রিস সুরসিক ছিলেন। তিনি বক্তৃতার মধ্যে ছাত্রদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ইংরাজী ও লাটিন হাস্যরসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করিতেন, আবার কখন কখন ছাত্রদের সঙ্গে ঐ সকল শ্লোক সমবেতভাবে আবৃত্তি করা হইত।

গুরুদাস শতমুখে তাঁহার ইতিহাসাধ্যাপক কাউয়েলের প্রশংসা করিতেন। অধ্যাপক কাউয়েল সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া অতঃপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদলাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে গুরুদাস এই অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ইতিহাস ও ইংরাজী পড়িতেন। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে চারিটা ইতিহাস অধ্যাপনার নির্দ্ধারিত সময় ছিল। অধ্যাপক কাউয়েল তাঁহার শিক্ষাদানের বিষয়-মধ্যে এমন ভাবে নিমজ্জিত হইয়া পড়াইতে থাকিতেন যে কখন ঘণ্টা শেষ হইত অধ্যাপক ও ছাত্রগণ উহা শুনিতেই পাইতেন না। ছাত্রগণ তাঁহার

বক্তৃতা শ্রবণে এমন আনন্দ লাভ করিতেন যে বক্তৃতা দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী হইলেও তাহারা কদাচ ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। একদা অধ্যাপকের পত্নী স্বামীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য শকট সহ কলেজে আসিয়াছিলেন; তিনি ৫টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্বামীকে ক্লাস ছাড়িয়া দিবার জন্য স্বয়ং অনুরোধ করেন। অধ্যাপক কাউয়েল তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র গুরুদাসকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, গুরুদাস ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথায় তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। একদা তিনি গুরুদাসকে তাঁহার সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। গুরুদাস তাঁহার অন্তরায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, "আমার সহাধ্যায়ী অতুল চন্দ্র মল্লিক ইংলণ্ডে যাইতে পারেন।" অধ্যাপক মন্তব্য করিলেন—"আমার মতে ব্রাহ্মণেরই ইংলণ্ডে গমন করা কর্ত্তব্য।"

সুকবি বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। গুরুদাস বলেন, যে এই অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গলা হইতে ইংরাজী অনুবাদ শিক্ষায় তাঁহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন।

গুরুদাস যখন কলেজে বি,এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ-প্রবর্ত্তক কবিবর মধুসূদন দত্তের সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদ-বধ-কাব্য প্রকাশিত হয়। কবিতা রচনায় চিরন্তন পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া তিনি নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করায় পণ্ডিতমণ্ডলী উক্ত কাব্যের অতিতীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে কাব্য রচনা করিয়া মধুসূদন অমর-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন উহার প্রথম প্রকাশকালে কবির প্রতি চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রূপ ও নিন্দার শাণিত বাণ বর্ষিত হইতেছিল। গুণগ্রাহী গুরুদাস তখন বয়সে বালক হইলেও মেঘনাদ কাব্য প্রণেতার রচনায় বিশেষত্ব ও ছন্দের নূতনত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি উক্ত কাব্যের সমালোচনা লিখিয়া উহা স্বাক্ষরশূন্য পত্রাকারে ডাক্তার ডফকে পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে এই অনুরোধ ছিল যে, ঐ কাব্যখানি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত করা হয়। ডাক্তার ডফ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনির্ব্বাহক সভার অন্যতম ক্ষমতাশালী সদস্য ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে মেঘনাদ-বধ-কাব্য সত্য-সত্যই পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল।

বি, এ শ্রেণীতে গুরুদাস সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠ করিতেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় অসামান্য আগ্রহের সহিত বাঙ্গলা অধ্যাপনা করিতেন। বাঙ্গলা সাহিত্য ছাত্রদের নিকট হৃদয়গ্রাহী করিবার নিমিত্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত সদৃশ-বাক্য আবৃত্তি করিতেন। প্রত্যেক প্রবন্ধ-মধ্যে যে-সকল ব্যাকরণগত বিশেষত্ব থাকিত তিনি সেই সমস্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতেন। গুরুদাস ইহার অধ্যাপনার বিশেষরূপ প্রশংসা করিতেন। বি, এ পরীক্ষায় গুরুদাস বাঙ্গলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার প্রতিযোগী নীলাম্বর বাবু তাঁহার অপেক্ষা সংস্কৃতে অধিকতর ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

১৮৬৪ সালে গুরুদাস বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে এক মাস মধ্যে এম, এ পরীক্ষায় উপস্থিত না হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ ঐ পরীক্ষার পুরস্কার ও পদকগুলি হইতে বঞ্চিত হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এই কঠোর বিধির অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। গুরুদাস যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন তখনও উক্ত বিধি প্রচলিত ছিল। তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে একমাস মধ্যেই তিনি এম, এ পরীক্ষা

প্রদান করিবেন। অধ্যক্ষ মিঃ সাট্‌ক্লিফ গুরুদাসকে এই চেষ্টায় প্রতি-নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিয়াছিলেন—"বৎস, ছায়ার অনুসরণ করিয়া কায়া হারাইও না।" যাহা হউক গুরুদাসকে এই কঠোর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেই হয় নাই, কারণ যে বার এই নিয়ম রহিত হয় সেই বারই বৎসর পরে তিনি এম, এ পরীক্ষা প্রদান করেন। গুরুদাস গণিতে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ বৎসরই নীলাম্বর বাবু সংস্কৃতে প্রথম হন। পর-বৎসর ১৮৬৬ সালে গুরুদাস আইন-পরীক্ষায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হইল। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার ললাটে জয়-তিলক পরাইয়া দিয়াছিলেন। স্কুল ও কলেজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিদ্যার্থীরা যত প্রকার সম্মান লাভ করিতে পারেন গুরুদাস সেই সমস্ত সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র-জীবন শিক্ষার্থীমাত্রের আদর্শ স্থল।

তৃতীয় অধ্যায়

—০৪৪*৪৪০—

গুরুদাসের শিক্ষকতা

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শিক্ষাদান কার্য্যে গুরুদাসের স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তিনি যখন এম, এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখনই কিয়ৎকালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপকতা করিতেন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ-প্রণেতা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেও তিনি কিছুকাল এই কলেজে অধ্যাপক ছিলেন।

গুরুদাসের অধ্যাপকতা-প্রাপ্তির সময়ে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও গুরুদাস অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত বাহুল্য-বর্জ্জিত সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। তাঁহার নিয়োগের সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহাকে তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগীয় ডাইরেক্টর মহাশয়ের সহিত একবার দেখা করিবার আদেশ করেন। তখন শীতকাল, গুরুদাস একখানি লালবনাত গায়ে জড়াইয়া ডাইরেক্টর বাহাদুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি গুরুদাসকে টোলের পণ্ডিত ভাবিয়া কথঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—"আমি আপনাকে কোন কার্য্য দিতে পারিব না, কোথায়ও পণ্ডিতের পদ খালি নাই।" তখন গুরুদাস জানাইলেন—"আমি পণ্ডিত-পদ-প্রার্থী নহি, প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইবার

প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছি।" ডাইরেক্টর মহোদয় বিস্মিত হইয়া তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পাঁচ মিনিট কাল আলাপ হইতে না হইতে তাঁহার অপ্রসন্নতা দূর হইল, তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে গুরুদাসকে তৎক্ষণাৎ নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন।

এই সময়ে গুরুদাস যাহাদের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন উহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত এবং আনন্দচন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি মহোদয় উত্তর-কালে স্বনামধন্য রাজকর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গুরুদাস শিক্ষাদানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছাত্রদের পরীক্ষা-পত্র তাহাদের সম্মুখে সংশোধন করিয়া দিয়া প্রত্যেকটি ভুল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। তাঁহার ছাত্র রমেশচন্দ্র সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, গণিত শিক্ষায় তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। একদা গুরুদাস তাঁহাকে উক্ত অমনোযোগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন যে, অঙ্কশিক্ষার প্রতি তাহার স্বাভাবিক অনুরক্তির অভাব রহিয়াছে। গুরুদাস উহার প্রতিবাদ করিয়া স্নেহ-সহকারে বলিলেন, এফ, এ ক্লাসের গণিতে দক্ষতা লাভ করিতে নিউটন বা লাপলেসের তুল্য প্রতিভাশালী হইবার দরকার করে না; কথঞ্চিৎ মনোযোগ প্রদান করিলেই উহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। অধ্যাপকের এই উপদেশ বাক্য অবনতমস্তকে শ্রবণ করিয়া সেই সময় হইতে রমেশচন্দ্র গণিত শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন।

গুরুদাসের তুল্য শিষ্টাচার ও সংযমী পুরুষ বিরল। তাঁহার আলাপ ও বক্তৃতা শুনিলে শ্রোতার মনে এই বোধ জন্মিবে যে, তিনি প্রত্যেকটি কথা যেন ওজন করিয়া উচ্চারণ করেন। তাঁহার বাক্য, কার্য্য ও চিন্তা সমস্তের মধ্যেই অসামান্য সংযম পরিলক্ষিত হইত। অধ্যাপনাকালে তিনি তাঁহার ছাত্রদের মনে সংযম ও শিষ্টাচারের আবশ্যকতা মুদ্রিত করিয়া

দিতেন। একদা প্রেসিডেন্সী কলেজের কতিপয় ছাত্র তাঁহার অনুমতি না লইয়া ক্লাস হইতে বাহিরে গিয়াছিল। তিনি উহাদিগকে কোন কঠোর দণ্ড প্রদান কিংবা তাহাদের প্রতি কোন পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন না। তিনি অপরাধী ছাত্র কয়টিকে আপনার সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেই ত বাহিরে যাইতে পারিতে, যখন দরজা খোলা তখন প্রাচীর লঙ্ঘনের ক্লেশ স্বীকার করিবার কি কোন আবশ্যকতা ছিল?"

প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী বিদ্যার্থীদের ব্রহ্মচর্য্যের তিনি বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, সেকালে গুরুগৃহে ছাত্রগণ যেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত বর্ত্তমান সময়ে সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পুনঃ প্রবর্ত্তন অসম্ভব, তবে গৃহে অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ যদি সেই আদর্শ মনে রাখিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করেন তাহা হইলে উহার সুফল অনেকাংশে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণের পরিচ্ছদে বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনের প্রতি তাহাদের মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, আহারে তাহাদের কোনরূপ বাধা-বিচার নাই, তাহারা দিবসের যে কোন সময়ে যাহা ইচ্ছা আহার করিয়া থাকে, যাহাতে দৈহিক কোনরূপ উপকার নাই এমন ব্যয়সাধ্য অলস ক্রীড়ায় তাহারা মত্ত হয়, ইতর সাহিত্য পাঠে তাহারা আনন্দিত হইয়া থাকে; গুরুদাস এই সকল অসংযমের তীব্র নিন্দা করিতেন। তিনি বলেন ঐ সকল আচরণ মধ্যে যে স্বার্থপরতা ও ভোগস্পৃহা রহিয়াছে তদ্দ্বারা ছাত্রদের সরলতা ও পবিত্রতা বিনষ্ট হয়।

১৮৬৬ সালে গুরুদাস পাঁচ মাস কাল জেনারেল এসেম্ব্লি বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকতা করেন। ঐ বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

তিনি উক্ত-পদ ত্যাগ করেন। শিক্ষকতার প্রতি গুরুদাসের এমন আকর্ষণ ছিল যে, ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পরেও পাটনা কলেজের অধ্যাপকতা এবং গৌহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদের নিমিত্ত আবেদন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ট্রেণ ও ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত যেমন অনায়াস হইয়াছে তখন তেমন ছিল না। তজ্জন্য তখন যাহারা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন তাহাদিগের পক্ষে সপরিবারে তথায় গমন সম্ভবপর হইত না। পরিজনবর্গের সঙ্গ ও গৃহের সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গুরুদাস বিদেশে একাকী বাস করেন, তাঁহার স্নেহশীলা জননীর উহা কদাচ অভিপ্রেত হইতে পারে না। অতঃপর গুরুদাস বহরমপুরে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে একটি অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেন, এই অধ্যাপকতার সহিত তিনি ওকালতী ব্যবসায় করিবারও অনুমতি পাইয়াছিলেন। মাতুলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে জননী অনুমতি প্রদান করায় গুরুদাস এই পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু জননী পুত্রকে এই সর্ত্তে আবদ্ধ করিলেন যে, পুত্র যখন এমন পরিমাণ অর্থসঞ্চয় করিতে পারিবেন যে উহা হইতে মাসিক একশত টাকা আয় হইতে পারে, তখনই তাঁহাকে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইবে। লোভশূন্যা জননী জানিতেন মাসে একশত টাকা হইলেই স্বচ্ছলভাবে পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

এই সময়ে কলিকাতা নগরস্থ শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব মুর্শিদাবাদের নবাবনাজিমের দেওয়ান ছিলেন। নবাবের পরে তাঁহার মত প্রতাপশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। রাজা প্রসন্ন নারায়ণ গুরুদাসের মাতুলের বন্ধু, সেই-সূত্রে তথায় গমন করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন।

বহরমপুরে প্রথম অবস্থান কালে গুরুদাস তাঁহার আত্মীয় বাবু প্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকটে অনেক আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন। ইনি এজেণ্ট বাকল্ সাহেবের কেরাণী ছিলেন। ইঁহার মত তেজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ লোক অতি বিরল। একদা এজেণ্ট সাহেব প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন —"বাঙ্গালীরা কদাচ সত্য কথা বলে না! আমরা কদাচ অসত্য বলি না।" প্রেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আমার সন্দেহ হয়, আপনি এই-বার অসত্য কথা বলিতেছেন।" এজেণ্ট সাহেব তাহার অধীন কেরা-ণীর মুখে এই তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়া-ছিলেন।

বহরমপুর কলেজে গুরুদাস প্রত্যহ এক ঘণ্টা আইন এবং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে এক ঘণ্টা গণিত অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার আইন অধ্যাপনা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত যে, দণ্ডবিধি বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য তত্রত্য বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ক্যাম্পবেল এবং নীল-দর্পণ অনুবাদক রেভারেণ্ড মিঃ লঙ্গ কখন কখন তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন। মিঃ ক্যাম্পবেল তাঁহার লিখিত শাসনবিবরণী মধ্যে গুরুদাসের অধ্যাপনার প্রশংসা করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

—০:*:০—

আইন-ব্যবসায়ী গুরুদাস

বহরমপুরে অবস্থান কালে গুরুদাস মুর্শিদাবাদের নবাবনাজিমের আইন উপদেষ্টার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাবু মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। মতিবাবু তখন বহরমপুরের সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই গুরু-দাস ওকালতীদ্বারা সর্ব্বপ্রথম অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মতিবাবু যেমন আইনজ্ঞ, তেমনি উদার ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। এইরূপ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তিনি প্রবীণ আইনজ্ঞরূপে অনেক নবীন আইন ব্যবসায়ীর যথার্থ হিত সাধন করিতে পারিতেন।

একদা মুসলমান উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এক মামলায় মতিবাবু প্রবীণ এবং গুরুদাস নবীন উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকালে গুরুদাস এমন একটি নূতন আইনসঙ্গত যুক্তির অবতারণা করিলেন যে, মতিবাবু উক্ত মামলায় প্রবীণের অধিকার ত্যাগ করিয়া গুরুদাসকেই আদালতে বক্তৃতা করিবার অনুমতি প্রদান করি-লেন। সাধারণতঃ প্রবীণ উকীল নবীনদিগকে এমন অনুমতি প্রদান করেন না।

আইনব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও গুরুদাস চিরদিন সাধুনীতির অনুসরণ

করিয়াছেন। কোন কোন উকীল মোকদ্দমার প্রারম্ভ-কালে এক পক্ষের আইন-উপদেষ্টা থাকিয়া উত্তরকালে পক্ষান্তরের উকীল নিযুক্ত হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু গুরুদাসের মত ন্যায়-পরায়ণ উকীলের পক্ষে এইরূপ কার্য্য কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। বহরমপুরে এক মামলায় এইরূপ ব্যাপারে গুরুদাসকে উকীল নিযুক্ত করিবার জন্য মামলাকারী বিস্তর অর্থ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুদাস কদাচ অর্থকে ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে স্থান দান করিতে পারেন না।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে সত্য ও ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা হয়, সাধারণতঃ লোকে ইহা বিশ্বাস করিতে চায় না। কিন্তু গুরুদাসের এই ধারণা সুদৃঢ় ছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বপ্রযত্নে সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই সংসারে পার্থিব ব্যাপারেও তিনি পরিণামে লাভবান্ হইবেন।

গুরুদাস যখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল তখন একদা তিনি ৫০৲ টাকা দৈনিক ফিসে একটি মামলা গ্রহণ করেন। ঐ মামলার শুনানির পূর্ব্বদিন বহরমপুর হইতে এক মামলায় তাঁহার আহ্বান হয়, সেই মামলায় তাঁহাকে দেড় সহস্র টাকা ফিস্ দেওয়ার কথা হয়। কলিকাতায় গুরুদাস যে মামলায় উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই মামলা অতি সাধারণ, উহা পরিচালনার জন্য কোন তীক্ষ্ণধী আইনজ্ঞের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে গুরুদাস বহরমপুরের মামলা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই নিমিত্ত তিনি কোনরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না। পরদিন গুরুদাস যখন হাইকোর্টে গমন করেন তখন বহরমপুরের সেই লোক তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তথাকার জজ

মামলা স্থগিত রাখিয়াছেন, সুবিধাক্রমে যেদিন তিনি যাইতে পারিবেন সেইদিনই উক্ত মামলার শুনানি হইতে পারিবে। গুরুদাস সন্তুষ্টচিত্তে সেই মামলা গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে তিনি কেবল উক্ত দুই মামলার ফিস্ পাইয়া লাভবান্ হইলেন তাহা নহে, আনুসঙ্গিক অপর এক বিষয়ে তাঁহার পাঁচশত টাকা লাভ হইল। ঐ সময়ে এক দালালের সহিত তাঁহার নারিকেলডাঙ্গা ভবন-সংলগ্ন একখণ্ড জমি ক্রয়ের কথা চলিতেছিল। যাহার জমি, তিনি উহা আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন, দালালের কথায় তিনি গুরুদাসের নিকট তিন হাজার টাকা দাম চাহিয়াছিলেন। গুরুদাস যখন বহরমপুরের মামলা প্রত্যাখ্যান করেন তখন ঘটনাক্রমে দালাল সেই স্থলে উপস্থিত ছিল। গুরুদাস বিনা আপত্তিতে দেড় হাজার টাকার মামলা ছাড়িয়া পঞ্চাশ টাকার মামলা লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কলিকাতা রহিয়া গেলেন—অর্থের প্রতি তাঁহার এতাদৃশী অনাসক্তি দর্শনে দালালের মন বিচলিত হইল, সে ভাবিল এমন লোককে প্রতারিত করিতে নাই। সেই দিনই দালাল আড়াই হাজার টাকায় গুরুদাসকে সেই জমি প্রদান করিল।

গুরুদাস দেওয়ানী অপেক্ষা ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালনায় অধিকতর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বহরমপুরে ওকালতী আরম্ভ করিবার কিছু দিন পরে এক ফৌজদারী মামলায় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ মামলায় এক মুসলমান জমিদারযুবক আসামী ছিলেন। ঐ যুবকের ভগিনীপতি পুলিশ সহায় করিয়া তাহার অনিচ্ছায় তাহার ভগিনীকে লইয়া যাইবার উদ্যোগী হইয়াছিল। এই ঘটনায় জমিদার যুবকের অনুচরগণ পুলিশদিগকে বিলক্ষণ প্রহার করে। গবর্ণমেণ্ট জমিদারযুবকের বিরুদ্ধে মামলা স্থাপন করিয়া গুরুদাসকে উকীল নিযুক্ত করেন। এই মামলায় বহরমপুরের সমস্ত উকীল

জমিদার যুবকের পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আত্মরক্ষার জন্য জমিদারযুবক পুলিশকে প্রহার করিয়াছে, ইহাতে তাঁহার কোন অপরাধ হয় নাই। পত্নীর প্রতি স্বামীর অধিকার প্রতিপন্ন করিয়া গুরুদাস ইহা প্রদর্শন করেন যে, পত্নীকে স্বীয় আশ্রয়ে লইয়া যাইবার দাবী স্বামী করিতে পারেন,—কারণ "স্বাধ্বী নারী যদি ক্রমাগত পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ঐ কারণেই লোকে তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে; সুতরাং বিবাহিতা নারীর স্বামীগৃহে গমন করিয়া স্বামীর সহিত বাস করাই সঙ্গত। * গুরুদাসের সুযুক্তি বিচারকের চিত্ত স্পর্শ করিল। তিনি জমিদারযুবককে তিন-দিনের নিমিত্ত কারাদণ্ড প্রদান করিলেন।

বহরমপুরে ওকালতীর সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবনাজিম একটি অতি জটিল মোকদ্দমায় গুরুদাসের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। সমস্ত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া গুরুদাস যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, হাই-কোর্টের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট মিঃ আর, ডি, ডয়নে সেই মত সমর্থন করেন। নবাব নাজিম হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, গুরুদাসের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই ঘটনায় তিনি একটি মূল্যবান্ ঘড়ি ও চেইন গুরুদাসকে উপহার দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাববংশ এক সময়ে বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধবংশসম্ভূত নবাব নাজিমের উপহার গুরুদাসের গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈ সংশ্রয়াং।
জনোঽন্যথা ভর্ত্তৃমতী বিশঙ্কতে॥
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে।
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পঞ্চম অধ্যায়

—:০:—
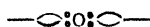
বিচারপতি গুরুদাস

ধর্ম্মভীরু গুরুদাস জীবনের সকল অবস্থায় স্বকীয় অসামান্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তিই যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুভব করেন কার্য্যতঃ তাহা করেন না। গুরুদাসের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে না। মনে হয়, পরলোকে গমন করিয়া তিনি পরমেশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অসংকোচে বলিতে পারিয়াছেন,—"পিতঃ! আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমরণ সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

ধর্ম্মাধিকরণে যখন তিনি বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তখনও তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ সকলকে আনন্দ দান করিত। তাঁহার বিচারে যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইত তাহাকেও ইহা স্বীকার করিতে হইত যে, গুরুদাস তাঁহার পক্ষের বক্তব্য মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছেন; রায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও বিচারপতি অবিচার করেন নাই।

১৮৭২ অব্দের শেষভাগে গুরুদাস হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে বহরমপুরে তিনি এমন খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া-

ছিলেন যে, অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সহযোগী আইন ব্যবসায়িগণ ও বিচারপতিরা সত্যনিষ্ঠা ও আইনের পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত গুরুদাসকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি যাহাদের মামলা গ্রহণ করিতেন সর্ব্বদা দক্ষতা সহকারে তাহাদের পক্ষ-সমর্থনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন কিন্তু তজ্জন্য ব্যবসায়ের অনুরোধে তিনি কদাচ সত্য ও ন্যায়বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতেন না। এই সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠাই তাঁহার সকল সাফল্যের মূল কারণ।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অনেকেই বিদ্যালোচনা পরিহার করিয়া থাকেন। বিদ্যানুরাগী গুরুদাস চির-জীবন ছাত্র ছিলেন বলা যাইতে পারে। হাইকোর্টে যখন তিনি ওকালতী করিতেন তখন তিনি আইনের অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং "দত্তক গ্রহণে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা", "বৃত্তিদান বিষয়ক হিন্দু আইন" এই দুই বিষয়ে সুচিন্তিত মৌলিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া "ডক্টর অব ল" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮৮ অব্দে মাননীয় বিচারপতি কানিংহাম যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের অনুমোদনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচক্ষণ আইনজ্ঞ গুরুদাস বিচারপতি নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ১৯০৪ অব্দের ৩১এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত বিচারকের মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্লিন ঐ সময়ে কয় বৎসরের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। গুরুদাসের বিচারবুদ্ধির প্রতি তাঁহার এমন অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি গুরুদাসকে সহযোগী অন্যতর বিচারপতি না করিয়া কোন মামলার বিচার করেন নাই। বিচারকের

মেজাজ যেমন শান্ত ও বুদ্ধি যেরূপ প্রখর হওয়া উচিত গুরুদাসের মেজাজ ও বুদ্ধি তেমনই ছিল।

হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ কালে উকীল সমাজ তাঁহাকে যে সাদর অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন উহাতে উক্ত হইয়াছে :— "বিচারপতিরূপে আপনি আইনের গভীর পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও অসামান্য সৌজন্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সকল আইন ব্যবসায়ীর মনে আপনি এই ব্যবসায়ের গৌরব এমন ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রচেষ্ট ছিলেন যে, সর্ব্বশ্রেণীর আইনব্যবসায়ী আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আপনি বিচারপতির গৌরবময় পদের কর্ত্তব্য এমনভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন যে সকল আইন-ব্যবসায়ীর নিকট আপনার এই জীবন উজ্জ্বল আদর্শ-স্থল হইয়া থাকিবে।"

তদানীন্তন এড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত জে. টি, উড্রফ ব্যারিষ্টরদের পক্ষ হইতে বলিয়াছিলেন ;—কোন মক্কেলের মুখে আমি কদাচ এমন অভিযোগ শুনি নাই যে, আপনি তাহার মোকদ্দমার সুবিচার করেন নাই। আপনি অবহিত হইয়া দুই পক্ষের তাবৎ বক্তব্য শ্রবণ করিয়া মোকদ্দমা যথার্থরূপে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, উভয় পক্ষের যুক্তি আলোচনা করিয়া মামলার রায় দিতেন। আপনি যাহার বিরুদ্ধে রায় দিতেন তিনিও মনে করিতেন আপনি অবিচার করেন নাই। বিচার ক্ষেত্রে আপনি স্বীয় চরিত্রগত স্বাধীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যেখানে মৌনাবলম্বন করিলেই আপনার প্রতিবাদ ব্যক্ত হইত সেই স্থলেও আপনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আপনি ব্যবহারাজীবী ও বিচারপতি-রূপে তাবৎ কার্য্যে সরলতা, সাধুতা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই অবসর গ্রহণকালে ১৯০৪ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা উইক্‌লি নোটস্ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :—গুরুদাস ১৬ বৎসর হাইকোর্টে বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন ঐ সময়ে তিনি: তাঁহার সহৃদয়তা, সুবিচার ও সৌজন্য দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়-বোধ অত্যুগ্র ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠা সহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতেন। বিচারপতিরূপে তিনি অনেক আইনের যথার্থ মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত মামলার রায়গুলি সর্ব্বথা সু-সম্পূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সেই সমস্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় মামলাগুলি বুঝিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত এই রায়গুলি ব্যবহার-শাস্ত্রের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অমায়িক ও ধীর প্রকৃতি গুরুদাস সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি স্বাধীন মত প্রচারে সাহসী হইতেন না, সহযোগী বিচারপতির মতে মত প্রকাশ করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। যাঁহারা বিচারালয়ের সংবাদ রাখিতেন না এমন ব্যক্তিগণই এইরূপ অনুদার, অসত্য, অন্যায় মত পোষণ করিতেন। বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত ভ্রমপূর্ণ ধারণা খণ্ডন করা যাইতে পারে।

একটি মামলা

একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—আসানসোল রেলওয়ে ষ্টেশনে এক রেলওয়ে কর্ম্মচারী এক হিন্দু-বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই মামলার বিচারে গুরুদাসের সহযোগী বিচারপতি

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাস করেন নাই, তিনি মনে করিলেন, ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে এই মামলা তৈয়ার করা হইয়াছে। গুরুদাস বুঝিলেন, আসামী যথার্থই অপরাধী, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস-যোগ্য। তিনি স্বতন্ত্র রায় প্রদান করিয়া আসামীকে দণ্ড দিলেন। অতঃপর তিন জন বিচারপতি এই দুই রায় বিচার করেন, প্রধান বিচারপতি এই তিন জনের অন্যতম ছিলেন। এই বিচারে গুরুদাসের প্রদত্ত রায়ই বহাল রাখা হইয়াছিল।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

জীবনের সকল অবস্থায় ছোট বড় সকল কাজে গুরুদাস তাঁহার অসামান্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার অমোঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ১৬ বৎসর হাইকোর্টে বিচারপতির কার্য্য করিয়াছেন, ঐ সময় মধ্যে অসুস্থতা ব্যতীত অপর কারণে কদাচিৎ অনুপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেন, আমি অনুপস্থিত হইলে পক্ষদের এবং তাহাদের উকীলগণের অসুবিধা হইবে। এই নিমিত্ত একান্ত অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত তিনি কদাচ অনুপস্থিত হইতেন না।

তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর দিনও গুরুদাস যথারীতি আদালতে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত তাঁহার পুত্রের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। পুত্রের এইরূপ অবস্থায় কয় জন পিতা কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইতে পারেন? গুরুদাস ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া আদালতে গমনপূর্ব্বক সহযোগী বিচারপতির সহিত এমন ধীরভাবে বিচারকার্য্য করিয়াছেন যে, তিনি গুরুদাসের বিপদ বা অশান্তির কোন বাহ্য লক্ষণ দেখিতে পান নাই। প্রধানবিচারপতি মহোদয়

গুরুদাসের পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আদালতের কার্য্য শেষ করিয়া বাটী গমন করিতে বলিলেন। গুরুদাস যখন গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার পুত্র মুমূর্ষু, অল্প কয় মিনিটের মধ্যেই পুত্রের প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত গগনে উড্ডীন্ হইল।

যতীন্দ্রচন্দ্র হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সহাধ্যায়ীদের মধ্যে সে অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গুরুদাস তাঁহার এই প্রিয় পুত্রের স্মৃতিতে হেয়ার স্কুলে "যতীন্দ্রচন্দ্র পদক ও পুরস্কার" প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৮৯২ অব্দ হইতে হেয়ার স্কুলে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে যে ছাত্র প্রথম হইতেছে সেই সেই বালক এই পুরস্কার ও পদক পাইতেছে। এই পুত্রের স্মৃতিতে গুরুদাস শিল্প-বিজ্ঞান সমিতিতেও এক স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুদাস

শিক্ষানুরাগ গুরুদাস-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। সুপণ্ডিত গুরুদাসের শিক্ষাই ধ্যান-জ্ঞান ছিল। আমাদের এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারাবৃত দেশ কি প্রকারে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে তাহাই তিনি বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষানুরাগী

সুপণ্ডিত বলিয়াই গুরুদাস নিখিল ভারতে সুপরিচিত। শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা "Thoughts on Education" নামক গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। গুরুদাস ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯০-৯৩ তিন বৎসরকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেরের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। গুরুদাসের সময় হইতেই ধীরে ধীরে কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ে বঙ্গভাষার আদর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন গুরুদাস উহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। উক্ত কমিশনের সভাগণের সহিত গুরুদাস এক মত হইতে না পারিয়া স্বকীয় স্বতন্ত্র মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৯০৬ অব্দে বঙ্গদেশে যে" জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় গুরুদাস সেই পরিষৎ-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। টাউনহলে এক মহতী সভায় তিনিই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সূচনা করিয়া এক জ্ঞান-গর্ভ সুচিন্তিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন—আমরা বিদেশীয় শিক্ষার বহিষ্কার করিতে চাই না, ঐ শিক্ষা না হইলে আমাদের চলিবে না, কিন্তু এই দেশের বিস্থার্থীদিগকে প্রথমতঃ সর্ব্বতোভাবে জাতীয় শিক্ষা পাইতে হইবে, তাহারা যখন জ্ঞানালোচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবে তখন তাহাদিগকে বৈদেশিক শিক্ষা প্রদান করিলে তাহারা উহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে।

বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষৎ কি প্রকারে জাতীয় শিক্ষা প্রদান করিবেন গুরুদাস তাঁহার বক্তৃতায় তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন।

শিক্ষা কিরূপে জাতীয় হইবে ?

শিক্ষাকে কি প্রকারে জাতীয় আকার দান করা হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমাদের মন হইতে সেই ভ্রান্তি দূর করিতে হইবে। স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি অনুরক্তি প্রশংসনীয় কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাকে জাতীয়তার দ্বারা কদাচ সীমাবিশিষ্ট করা যাইতে পারে না, সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপর শিক্ষা-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ উক্ত সত্য আংশিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পরিষৎ স্বদেশীয়দের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, টেক্নিকেল ও ব্যবসায়মূলক শিক্ষাদান করিবেন, কিন্তু অধুনাবিদ্যমান প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহের এবং উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ প্রাচ্য আদর্শ মুদ্রিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইবেন এবং পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য উচ্চ আদর্শও শিক্ষা দিবেন।

শিক্ষাজীবনের শেষভাগে শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি যখন বিকশিত হইয়া উঠে, তখন তাহাদের পক্ষে বিদেশী উন্নত চিন্তা ও ভাব আয়ত্ত করিয়া লওয়া অনায়াস হইতে পারে, কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য ব্যাপার, জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগকে বিদেশী বিষয় শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিলে উহার ফলে তাহাদের মনে স্বাভাবিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হইবে।

শিক্ষার্থী যখন সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সমীপে উপস্থিত হইল, তখন সে মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিতে জানে। কেবল তাহা নয়,

ঐ সময়ে তাহার মনে যে সকল ভাব ও চিন্তা থাকে উহাই তাহার জাতীয় সম্পদ্‌। তাহার ঐ সকল বাল-সুলভ ভাব উপেক্ষা না করিয়া সেই সমস্ত বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করাই শিক্ষক মহাশয়ের কর্ত্তব্য। পরিবেষ্টনের মধ্য হইতে শিক্ষার্থী যে ভাব সঞ্চয় করে, বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত উপেক্ষিত হয় বলিয়াই ইংরাজী শিক্ষা এই দেশে আশানুরূপ সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। এই জন্যই শিক্ষা-পরিষৎ যেরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, উহাতে শিক্ষার্থী-দিগকে স্বদেশ, স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী ইতিহাস, স্বদেশী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটী আছে, তাহা আমরা সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি এবং শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সেই সকল দোষ যাহাতে দূর হয়, তাহার জন্য চেষ্টাও করিতেছি, কিন্তু এই শিক্ষাপদ্ধতি হইতে আমরা যে সকল উপকার পাইয়াছি, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই জন্যই আমরা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎকে আধুনিক বিদ্যালয়সমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না করাইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

আধুনিক শিক্ষাবিভাগের দোষ যতই থাকুক এতদ্দ্বারাই শিক্ষা দেশ মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা দোষ বিচারের যোগ্যতা লাভ এবং সেই সকল সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছি।

সংস্কারের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক-দল বলেন, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি উচ্চতর এবং পরীক্ষা কঠোরতর করা হউক, তাহা হইলে অযোগ্যেরা শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইবে। যাহারা কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী নহেন, যাহারা লোকমতের দ্বারা বিচলিত হন, এমন লোককে শিক্ষা পরিচালনার ভার প্রদান করাহইবে না।

কিন্তু অনেকেই বলেন, শিক্ষাবিভাগের ত্রুটীগুলি অতি গভীর, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কিন্তু কোন কঠোরতার প্রয়োজন নাই। পরিষৎ শিক্ষার ভিত্তি এমন উদার ও প্রশস্ত করিতে ইচ্ছুক যে, যাহারা শিক্ষা পাইতে অভিলাষী, তাহারা যে যাহার যোগ্য, সে সেইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে; একান্ত অক্ষম ব্যতীত কেহ শিক্ষালাভের সুযোগে বঞ্চিত হইবে না।

কেহ যেন ইহা মনে করেন না যে, প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করিবে, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের অপর সকল জাতির প্রতি অনুরাগের অভাব ঘটিলে আমরা উহা সহিতে পারিব না। আমরা ইহা সরলভাবে বিশ্বাস করি যে, মানুষের আপনার প্রতি ভালবাসা যদি বিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা কদাচ অন্যের প্রতি ভালবাসার বিরোধী হইতে পারে না। অপরের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কেহ কদাচ আপনার স্বার্থ সুরক্ষিত করিতে পারে না।

শিক্ষাবিস্তারের অবারিত ক্ষেত্র

নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই দেশে নব নব শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার অবারিত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এই দেশের অতি সামান্য সংখ্যক লোকই শিক্ষা পাইতেছে। সর্ব্বত্রই এখন এই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। নূতন প্রণালী অবলম্বনে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা এখন কোন ক্রমে অসঙ্গত হইতে পারে না। এতন্মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার কোন সম্ভাবনা নাই।

সর্ব্বপ্রকার শত্রুতাচরণ পরিহার করিলেও আমাদের মনে এই আশা আছে যে, ভগবৎ প্রসাদে আমাদের এই পরিষৎ অপর সকল শিক্ষালয়ের সুযোগ্য প্রতিযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা।

শিল্প ও বিজ্ঞানের যে সকল শাখায় ছাত্রগণ শিক্ষা পাইলে আমাদের দেশের ধনসম্পদ্ বর্দ্ধিত হইতে পারে, পরিষৎ সেই সকলের শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিতে প্রচেষ্ট হইবেন।

টেক্নিকেল শিক্ষা ব্যতীত এই দেশের অন্ন সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না। আমাদের কোন কোন বন্ধু এমন কথাও বলিতেছেন যে, আমাদের যতদূর শক্তি আছে, তাহার সমস্তই শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানে নিয়োজিত করা হউক। টেক্নিকেল শিক্ষাদানের ঐকান্তিক আবশ্যকতাবোধে আমি কাহারও কাছে পরাভব স্বীকার করি না। আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মহৎ দানে বেঙ্গল টেক্নিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু তাহা হইলেও আমি সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি উদার শিক্ষা উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহি। বাহ্য সম্পদের নিমিত্ত টেক্‌নিকেল শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, যথার্থ আনন্দের নিমিত্ত সাহিত্য দর্শন প্রভৃতির শিক্ষার তেমনই প্রয়োজন। এই উদার শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া আমরা যদি কেবল টেক্‌নিকেল শিক্ষা দ্বারা বাহ্য সম্পদের সাধনা করি, তাহা হইলে উহা ক্রমাগত দৈহিক অভাব বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে অমঙ্গলের পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে এবং ইহা হইতে মহাজন ও শ্রমজীবীদের মধ্যে যে বিরোধ জন্মিবে, উহার নিবৃত্তি কস্মিনকালেও হইবে না।

বেঙ্গল টেক্‌নিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটের সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন :—"বিবিধ আবিষ্কারের এই এক ফল দেখা যাইতেছে যে, এতদ্দ্বারা আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নত এবং জীবিকা-সংস্থান-সংগ্রাম উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনরক্ষার জন্য আমাদিগকে কিয়ৎপরিমাণ সংগ্রাম করিতেই হইবে। আমরা যদি বস্তুতঃ উন্নত হই, তাহা হইলে সত্তারক্ষার এই সংগ্রাম বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। এই বাহ্য সংগ্রামেই যদি আমাদের শক্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মা উচ্চতর অবস্থালাভের শক্তি হারাইয়া ফেলিবে।"

এই উক্তি যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তিনি: কল্পনাপ্রিয় ভাবুক নহেন, তিনি একজন কর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত।

ধর্ম্মশিক্ষা

পরিষৎ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তর মতবিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পরিষদের সভ্যগণ সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য এক ঘণ্টা সময় রাখা হইবে, তখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণ স্ব স্ব ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষকদের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। এই শিক্ষাদানমধ্যে কোন বাহ্য অনুষ্ঠান থাকিবে না। এইরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের যুবকগণের মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠুক, তাহারা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করুক, তাহা হইলে জীবনের সকল সঙ্কট-মধ্যে যুবকগণ ন্যায়পথে অবিচলিত থাকিতে পারিবে। তাহারা বুঝিবে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় এক দেবতা অহর্নিশ তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন।

শিক্ষার আদর্শ ও সংযম

ভারতের চিরন্তন রীতি অনুসারে পরিষৎ শিক্ষার আদর্শ উন্নত ও

সংযমবিধি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। শিক্ষার্থীর মন নানা জ্ঞানে বিভূষিত করিয়া দিবার জন্য যথোচিত আয়োজন করিতে হইবে। বিদ্যার্থীর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, তাহার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বন-বৃত্তি যাহাতে উন্মেষিত হয়, শিক্ষা তদনুরূপ করিতে হইবে।

শিক্ষার্থী আপনার সমস্ত চিত্তবৃত্তি এমন সুসংযত করিবে যে, গুরুজনকে সম্মান-প্রদর্শন, তাঁহাদিগকে মানিয়া চলা, কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তৎপরতা ইত্যাদি তাহার পক্ষে সর্ব্বথা স্বাভাবিক হইবে।

প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান

এক্ষণে বিদ্যালয়সমূহের নিম্নশ্রেণী ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষায় সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাত্রদের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর। ইংরাজী অতি দুরূহ ভাষা, বিদেশীর পক্ষে এই ভাষা আয়ত্ত করা বড়ই ক্লেশকর,বিশেষতঃ বাঙ্গলা-ভাষার সহিত এই ভাষার প্রভেদ আকাশ পাতাল; বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী ভাষার অতি ক্ষীণ সাদৃশ্যও নাই।

পরিষৎ শিক্ষার্থীদিগকে সমস্ত বিষয় প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাতে ছাত্রদের ক্লেশভার অনেকাংশে লাঘব হইবে।

এই প্রস্তাবনামতে বাঙ্গলা ও উর্দ্দু-ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে।

বিবিধ শিল্পদ্রব্যের নিমিত্ত আমাদিগকে বিদেশীয়দের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই পরাধীনতা আমরা অতি উগ্রভাবে অনুভব করিয়া থাকি। আমরা যখন পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করি, সেই ভাববিনিময়কালে আমরা কত বিদেশী শব্দ ব্যবহার করি, দুঃখের বিষয় এই যে, এই শোচনীয় পরাধীনতা আমাদিগকে তেমন করিয়া পীড়িত করে না। এই দৈন্য দূর করিবার জন্য আমাদিগকে নব নব শব্দ সৃষ্টি করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

—○০○—

গুরুদাসের শিক্ষানীতি

গুরুদাস অসাধারণ শিক্ষানুরাগী পুরুষ ছিলেন। যদ্দ্বারা মানবের দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ শিক্ষাকেই তিনি যথার্থ শিক্ষা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত সুশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ বলিষ্ঠ, বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং আত্মা সুবিমল হইবে।

গুরুদাস বলিয়াছেন,—এই সুখ-দুঃখময় পৃথিবীতে সকলেই সুখলাভ ও দুঃখ নিবারণ করিতে নিরন্তর ব্যস্ত; সুতরাং শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতা উভয়েই শিক্ষা সুখকর করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। বরং ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক শিক্ষকের মনে এই ধারণা আছে যে, শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা বর্দ্ধিত করিলেই উহার কার্য্য-কারিতা বৃদ্ধি হইবে। সত্য বটে দেহ, মন ও আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইলে, কঠোরতা সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টি হয়। সুখের নিমিত্ত অধিক লালসা ভাল নহে, শিক্ষক যদি তাড়নার দ্বারা শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, উহার ফল শুভ হইবে না। শিষ্য মুখে গুরুর উপদেশ শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহার মনে সুখের লালসা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে কিন্তু শিক্ষক যদি কাঠিন্য অবলম্বন না করিয়া মধুর বাক্যে শিক্ষার্থীকে হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, অধিক সুখ-লালসা সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর মন হইতে সেই লালসা অন্তর্হিত হইবে।

"যাহা পরবশ তাহা দুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহা সুখ। সুখ-দুঃখের

এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।” শিক্ষার ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে শিক্ষার্থী যাহা করিবে তাহা যদি সে আপনার করণীয় বলিয়া স্বেচ্ছায় করে, তাহা হইলে উহা তাহার ক্লেশের কারণ হইবে না।

প্রথম-শিক্ষার্থীর বিচার বোধ নাই। গুরুর প্রতি ভালবাসা থাকিলে তাঁহার আদেশ সে প্রফুল্লমনে পালন করিবে। শিক্ষা কোমল ভাব ধারণ না করিলে শিক্ষার্থীর গুরুভক্তির সঞ্চার কিংবা গুরুর আদেশ পালনে স্বভাবতঃ আগ্রহ জন্মিতে পারে না।

শিক্ষা সর্ব্বথা সুখকর হওয়া উচিত, কিন্তু উহা করিবার উপায় কি তাহাই বিচার্য্য। গুরুদাস বলেন—নবীন শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়ের অনাবশ্যক জটিলভাব বর্জ্জন করিয়া তাহার শ্রমের লাঘব করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পাঠের আবশ্যক জটিল কথাগুলি বাদ দিলে চলিবে না। সেই উপায়ে তাহার শ্রম লাঘব করা আর কামান ফেলিয়া দিয়া রণতরী লঘু ও বেগবতী করা-একই কথা।

শিক্ষার্থীর শ্রম লাঘব করিতে হইলে শিক্ষককে শ্রম স্বীকার করিয়া বুঝিবার বিষয়গুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে; তিনি যে বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন সেই বস্তু বা তাহার অনুকল্প শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। শিক্ষার বিষয় যদি কোন কার্য্য হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিবার পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। পাঠ সহজে আয়ত্ত করিবার যদি কোন সঙ্কেত থাকে ছাত্রকে তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত।

শিক্ষা কি প্রকারে আনন্দপ্রদ করা যাইতে পারে তাহা পৃথিবীর বহু সুধী-ব্যক্তি আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আনন্দের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। সেখানে শিক্ষকগণ

অনাবশ্যক তাড়না দ্বারা শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা বা অপর কোন কার্য্যে বাধা প্রদান করেন না। স্বায়ত্তশাসনলব্ধ শিক্ষার্থীরা তথায় আনন্দে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যাদাতা শিক্ষক সানন্দে যাহা দান করেন গ্রহীতা শিক্ষার্থী তাহা প্রফুল্লমনে গ্রহণ করিয়া থাকে। শিক্ষাকে এই ভাবে আনন্দপ্রদ করিবার চেষ্টাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা।

গুরুদাসও শিক্ষাকে আনন্দপ্রদ করিবার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—শিক্ষায় আনন্দ উৎপাদনার্থ নানাস্থানে নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ঐ সকল পদ্ধতির মূলকথা শিক্ষাকে ক্রীড়ায় পরিণত করা। ইউরোপে এই পদ্ধতি ফ্রবেলের কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ "বাল্যোদ্যান" নামে অভিহিত হয় এবং বিদ্যালয় বালকের ক্রীড়া-বন বলিয়া পরিগণিত হয়। পদ্ধতিটি স্থূলতঃ মন্দ নহে কিন্তু তাহা ক্রমশঃ এত সূক্ষ্ম-নিয়মাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, তদ্দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সুখকর না হইয়া বরং কষ্টকর হইয়া উঠে।

গুরুদাস বলিয়াছেন,—শিক্ষাকার্য্য সুখকর করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে তাড়না বা ভয়-প্রদর্শন না করিয়া আদর ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর যে উপকার লাভ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তাহাকে দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার বিষয় সুমিষ্টভাষায় চিত্ত-রঞ্জক উদাহরণ ও সুন্দর চিত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া হৃদয়গ্রাহিভাবে বিবৃত করা উচিত। চতুর্থতঃ, শিক্ষা এক অসাধারণ ও দুরূহ ব্যাপার ইত্যাদিরূপ গম্ভীরভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উহা উপস্থিত করা উচিত নয়; উহা আহার-বিহারের মত সুখকর নিত্য-কর্ম্ম সেই ভাবে উহার প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে হইবে।

শিক্ষার্থীকে তাহার শক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেক শিক্ষক ও অভিভাবক ছাত্রদিগকে অল্প সময় মধ্যে অধিক বিদ্যা শিখাইবার

জন্ম অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বাভাবিক পরিণতির নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া যদি কেহ কিলাইয়া কাঁটাল পাকাইতে চাহেন, তাহার সেই চেষ্টা যেমন অনর্থের হেতু হয়, উক্ত অসহিষ্ণু শিক্ষক ও অভিভাবকদের চেষ্টা তদ্রূপ শিক্ষার্থীদের অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

যেমন অতিরিক্ত ভোজন শরীরের পুষ্টিসাধক নহে—তেমনই অতিরিক্ত পাঠ মনের পুষ্টি-সাধক নহে। কিন্তু দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন একটা সহজ ও স্থূল কথাও অনেক সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের অভি-ভাবকগণ বিস্মৃত হইয়া যান। অনেকে মনে করেন, যত বেশী পুস্তকের পাতা উল্টান হইল তত বেশী পড়াশুনা হইল। তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা হইল কি না এবং এক একটা নূতন কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে শিক্ষার্থীর কতবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করা আবশ্যক ইহা কেহই ভাবেন না।

শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে পাঠের বিষয়-সকল নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থী বালকের সকল বিষয় বুঝিবার শক্তি থাকে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষার দ্বারা ক্রমশঃ বুদ্ধির বিকাশ হয়। বুদ্ধির বিকাশ অনুসারে ক্রমশঃ সহজ হইতে দুরূহ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রাচীন ভারতে ছিল। শিক্ষার্থীর শক্তির অতিরিক্ত বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া নিষ্ফল।

শিক্ষার্থীকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা উত্তমরূপে না শিখাইলে কোন ফলোদয় হয় না। গুরুদাস বলিয়াছেন,—যখন যে বিষয় শিখান যায় তখন শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন কারণে কোন বিষয় বুঝাইতে বাকী থাকে সে

কথা শিক্ষার্থীকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন বিষয় ভাল করিয়া না শিখাইলে কিরূপ দোষ ঘটে তাহার দৃষ্টান্ত এই :—

একবার কোন আত্মীয়ব্যক্তি তাঁহার দশ কি একাদশবর্ষবয়স্ক পুত্রটি কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে তাহা আমাকে পরীক্ষা করিতে বলেন। সে বালক তখন একখানি ভূগোল পড়িতেছিল দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূর ?

উত্তর।—নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল।

প্রশ্ন। তুমি এখন পৃথিবী হইতে কতদূর ?

এই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিল না। বালকটি যে নির্ব্বোধ এমন নহে। কিন্তু দূরত্ব ও নৈকট্য কাহাকে বলে এবং পৃথিবী কোথায় এই সকল কথা তাহাকে ভালরূপে বুঝান হয় নাই।

গুরুদাস বলিয়াছেন,—শিক্ষার্থীকে সকল কার্য্য যথানিয়মে যথা সময়ে করিতে হইবে। মনুষ্য কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে কর্ম্মী হইতে হইবে। কর্ম্মী হইতে হইলে সকল কার্য্য যথা-নিয়মে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করিবার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের কর্ত্তব্য কি এবং কি প্রকারে তাহা সম্পন্ন করিতে হয় তাহার জ্ঞান থাকিলেই হইবে না। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য সম্পাদনের অভ্যাস থাকা দরকার।

সরলরেখা কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি, কিরূপে তাহা অঙ্কিত করিতে হয় তাহাও জানি, কিন্তু অভ্যাস না থাকিলে যন্ত্রের বিনা সাহায্যে কেহ একহস্ত পরিমিত একটি রেখা আঁকিতে পারিবে না।

কোন কার্য্য অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। তখন কিছুদিন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সতর্ক

থাকিতে হইবে। কিন্তু মঙ্গলময়ী প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কোন কার্য্য একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর কিছু বলিতে হয় না, তখন শিক্ষার্থী আপনা হইতে যথানিয়মে অভ্যস্ত কার্য্য করিবে, না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না।

গুরুদাস অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—শিক্ষার্থীকে সংযমী হইতে হইবে। পাঠাভ্যাসকালে শিক্ষার্থীর মন যদি অন্যদিকে প্রধাবিত হয় তাহা হইলে সে কিছুতেই উত্তমরূপে পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

স্বেচ্ছায় আপনপ্রবৃত্তি দমন করার নাম আত্মসংযম। না বুঝিয়া পরের ইচ্ছা ও আদেশমত কার্য্য করাকে আত্মসংযম বলা যায় না। সুখার্থীকে সংযত হইতে হয়। সুতরাং শিক্ষা সুখকর করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে সংযত করিতে হইবে। যাহারা বলহীন তাহারাই লোভ মোহ ক্রোধ প্রভৃতির অধীন হইয়া কার্য্য করে।

শিশুর শিক্ষা

গুরুদাস বলিয়াছেন,—শিশুকে শিখাইবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, শিশুকে তাড়না না করিয়া তাহার ঔৎসুক্য ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা সুখকর করা যাইতে পারে। প্রথম অবস্থায় শিক্ষা বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া আবশ্যক। শিশু যতদিন পড়িতে না শিখে, অন্য ভাষা না জানে, ততদিন তাহার শিক্ষা বাচনিক এবং মাতৃভাষায় না হইয়াই পারে না। মাতৃভাষায় বাচনিক শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর শব্দ-সম্বল ও বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইলে তাহাকে জানা শব্দ ও বিষয়-বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে এবং পুস্তকের কথা ও অন্য জ্ঞাত বিষয় লিখিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষক মনে রাখিবেন

যে, উচ্চারিত শব্দের বর্ণবিশ্লেষণে এবং লিখনে অভ্যস্ত বলিয়া আমাদের পক্ষে উহা সহজ হইলেও শিশুর পক্ষে উহা তত সহজ নহে।

শিক্ষার ভাষা ও আদর্শ

অনেকেই বলেন—জাতীয় ভাষায় জাতীয় সাহিত্য দর্শনের আদর্শ অনুসারেই শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ ইহাও বলেন, শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক হইবে, উহার মধ্যে জাতীয়তার গণ্ডী রচনা করিলে শিক্ষার্থীর মন উদারতার স্থলে সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই দুই মতই কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, কোন মতই সম্পূর্ণ সত্য নয়।

যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলেই শিক্ষার্থী অল্পায়াসে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। বিজাতীয় ভাষায় শিখিবার শ্রম ও বুঝিবার অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হয় না।

জাতীয় সাহিত্য দর্শনের উচ্চ আদর্শ অনুসারে শিক্ষা প্রদান করিলে উহা অনায়াসে ফলপ্রদ হয়; কারণ শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মন কিয়ৎ-পরিমাণে পূর্ব্ব হইতেই উক্ত আদর্শ অনুসারে গঠিত হইতে থাকে। সুতরাং উক্ত আদর্শমতে শিক্ষা পাইলে তাহাকে আর ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয় না।

কিন্তু তজ্জন্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষায় অবহেলা এবং বিজাতীয় সাহিত্য দর্শনের উচ্চ আদর্শের প্রতি অনাস্থা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিজাতীয় উচ্চাদর্শের ও সদ্‌গুণের অনাদর বৃথা ও ভ্রান্তি জাত্যভিমানের কার্য্য।

বিজাতীয় ভাষায় অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। সেই ভাষা আমাদেরই ন্যায় এক জাতীর মনুষ্যের ভাষা, তদ্দ্বারা আমাদের ন্যায়

এক জাতীয় মনুষ্য তাহাদের সুখ-দুঃখাদি মনের ভাব এবং সরল ও জটিল জ্ঞানের কথা ব্যক্ত করে:; সুতরাং বিজাতীয় ভাষা মনুষ্যের পক্ষে অবহেলার বস্তু নহে।

শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক ও উদার হওয়া উচিত সন্দেহ নাই কিন্তু সে নিয়ম উচ্চস্তরের নিয়ম, নিম্নস্তরে প্রযোজ্য নহে। শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বেই শিশু জাতীয় ভাষা আয়ত্ত করে এবং কতকগুলি জাতীয় সংস্কারে দীক্ষিত হয়। সুতরাং তাহার সেই সংস্কারগুলির উৎকৃষ্ট অংশ বদ্ধমূল ও বিকশিত করিবার জন্য জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিলে নিঃসন্দেহ শীঘ্র সুফল পাওয়া যাইবে।

শিক্ষার উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত ও বিজাতীয় উচ্চাদর্শ যথোচিতরূপে অনুকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। জাতীয়-ভাব ও স্বদেশানুরাগ উচ্চ সদ্‌গুণ এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর প্রভূত হিতসাধন হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়-ভাব ও স্বদেশ-প্রীতি অন্য দেশ ও অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হওয়া কদাচ কল্যাণকর হইতে পারে না।

সুশিক্ষার জন্য সুশিক্ষকের প্রয়োজন

অধুনা শিক্ষাক্ষেত্রে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন সুশিক্ষকের অভাব আছে ইহা একরূপ সর্ব্বজন স্বীকৃত কথা। যিনি শিক্ষাদান দ্বারা অপরের সংশয় ছেদন করিবেন তাহার স্থির-ধী হওয়া আবশ্যক। গুরুদাস উপযুক্ত শিক্ষকের কতকগুলি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শিক্ষকের স্বর স্পষ্ট ও উচ্চ, দৃষ্টি সূক্ষ্ম, ও শ্রবণ শক্তি তীব্র হওয়া দরকার। বহুছাত্রকে যিনি একসঙ্গে শিক্ষা দিবেন তাহার উক্ত শারীরিক গুণগুলি না থাকিলে চলে না।

শিক্ষকের ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন। সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষকও যদি চঞ্চল হন তাঁহার দ্বারা সুশিক্ষাদান সম্ভবপর হইতে পারে না। যাঁহাকে এককালীন অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দিতে হইবে, অনেকের সংশয় ছেদন করিতে হইবে তিনি স্বয়ং চঞ্চল হইলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

শিক্ষকের সকল শাস্ত্রে সাধারণ এবং কোন এক শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকা দরকার। শাস্ত্র সকল পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় অপর শাস্ত্রের উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষকের যদি সকল শাস্ত্রের বোধ থাকে তাহা হইলে তিনি পাঠের বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া উহা ছাত্রের মর্ম্মে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। শিক্ষকের যদি কোন একটি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য না থাকে তাহা হইলে তাহার অধ্যাপনায় শাস্ত্রানুরক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না এবং সেই অধ্যাপনা কাহারও মনে কোন শাস্ত্রানুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্যে যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্রে বিশেষ গভীর পাণ্ডিত্য থাকা অত্যাবশ্যক।

যিনি শিক্ষাদান করিবেন তাঁহার শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। মনু, প্লেটো, রুষো, লক্, স্পেন্সর, বেন প্রভৃতি পূর্ব্বপূর্ব্ব সুধীগণ শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।

শিক্ষক সহিষ্ণু ও পবিত্র-স্বভাব হইবেন, তাহা না হইলে তিনি স্থিরচিত্তে শিক্ষাদান করিতে এবং শিক্ষার্থী তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ শ্রদ্ধাযুক্ত মনে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ

শিক্ষাকার্য্য ও শিক্ষার্থীর প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহার পক্ষে

শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ বিধেয় হইতে পারে না। যেরূপ আগ্রহ সহকারে শিক্ষাদান করিলে উহা শিক্ষার্থীর মনে নবজীবনের সঞ্চার করিতে পারে তেমন শিক্ষাদান তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক করা অবিধি ও অনিষ্টকর। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ লক্ যথার্থ বলিয়াছেন ঃ—

"বায়ু বিকম্পিত পত্রে স্পষ্ট লিখনের চেষ্টা এবং ভয়ে কম্পিত ছাত্রের মনে স্থায়ী উপদেশ অঙ্কিত করণের চেষ্টা তুল্য।"

ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের যদি সহানুভূতি না থাকে তাহা হইলে তিনি ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। যে শিক্ষক ছাত্রের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, ছাত্র তাঁহাকে ভক্তি করে এবং আগ্রহ সহকারে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

উপদেশ-দাতা এবং উপদেশ-গ্রহীতার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ হইবে নিম্নলিখিত আখ্যানে উহা বিবৃত হইয়াছে ঃ—

কোন দরিদ্র মুসলমান তাহার পুত্রকে লইয়া মোহম্মদের নিকট আসিল ; পুত্র চিনি খাইতে ভালবাসে, সে তাহা যোগাইতে পারে না, অতএব কি করিবে সেই উপদেশ চাহে।

মোহম্মদ তাহাদিগকে একপক্ষ পরে পুনর্ব্বার আগমন করিবার আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহারা যখন আবার তাঁহার নিকট আগমন করিল তখন মহাপুরুষ পুত্রকে ওজস্বিনী ভাষায় ক্রমশঃ চিনি ত্যাগের উপদেশ প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য সেই উপদেশ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। পিতা বিস্মিত হইয়া পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সামান্য উপদেশদানের নিমিত্ত আপনি এক পক্ষকাল সময় গ্রহণ করিলেন কেন? তদুত্তরে মহাপুরুষ সহাস্যে বলিয়াছিলেন—

আমি অতিশয় মিষ্টপ্রিয় ছিলাম, নিজে চিনি না ছাড়িয়া অন্যকে উহা ছাড়িবার উপদেশ দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম।”

শিক্ষক যখন ছাত্রকে কোন উপদেশ প্রদান করেন তখন উক্ত আখ্যানটি স্মরণ করিবেন।

কাহারও কাহারও মনে এই ভুল ধারণা আছে যে শিক্ষার্থীর মনে একটু ভয় না জন্মাইলে সে শিক্ষককে মানিবে না; এই ধারণা ভুল। শিক্ষা ও শাসন যদি অভিন্ন হইত তাহা হইলে ইহা হইতে পারিত। ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন শিক্ষা হয় না।

অষ্টম অধ্যায়
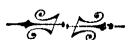
গুরুদাসের সামাজিক মত

সামাজিক বহু বিষয়েই গুরুদাস প্রচলিত দেশাচারের অনুবর্ত্তন করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষণশীল বলা যাইতে পারে।

বাল্য-বিবাহ

অধুনা শিক্ষিত সমাজের অনেকেই বাল্য-বিবাহের বিরোধী। গুরুদাস বাল্য-বিবাহের বিরোধী ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন ;—এক সময়ে এইদেশে বাল্য-বিবাহ যে ভাবে প্রচলিত ছিল তাহাতে অনেক দোষ ছিল এবং তাহা হইতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে সুতরাং উক্ত বিবাহের উপর লোকের অশ্রদ্ধা ঘটিবে তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

পাঁচ কি ছয় বৎসরের বালিকার সহিতদশ কি বার বৎসরের বালকের

বিবাহ আমি অনুমোদন করি না। যেরূপ বাল্য-বিবাহের পক্ষে কথা বলিবার আছে, সেইরূপ বিবাহে কন্যার বয়স দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ, বরের ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইবে।

যাহারা বাল্য-বিবাহের বিরোধী তাহারা বলেন,—বুদ্ধি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নহে। বাল্য বয়সে কাহারও জীবনের চির-সঙ্গিনী বা চির-সঙ্গী বাছিয়া লইবার ক্ষমতা থাকে না। গুরুদাস লিখিয়াছেন—কিন্তু আর দুই চারি বৎসর অপেক্ষা করিলে কি সেই ক্ষমতা জন্মিবে? যাহারা বাল্য-বিবাহের বিরোধী তাহারাও যৌবন-বিবাহের বিরোধী নহেন, হইলেও চলিবে না।

যৌবন-বিবাহে পাত্র-পাত্রী পরস্পরের নির্ব্বাচনে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইলেও যদি তাহাদের ভুল হয় তাহা হইলে সেই ভুল সংশোধনার্থ বিবাহ-বন্ধন ছেদন ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। বাল্য-বিবাহেও ঐরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে যৌবন-বিবাহে যত তত অধিক নহে। কারণ যৌবন-বিবাহে যুবক-যুবতী আপন আপন প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে এবং ঐ সময়ে সে অবস্থায় প্রবৃত্তি-ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা প্রচুর; কিন্তু বাল্য-বিবাহে উদ্ধতপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত যুবক-যুবতীর স্থলে সংযত প্রবৃত্তিযুক্ত সদ্‌বিবেচনাচালিত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া জনকজননী নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প।

যে সকল দেশে অধিক বয়সে বিবাহ প্রচলিত, সে সকল দেশে বিবাহ-বিভ্রাট এবং বিবাহবন্ধন-ছেদনের আবেদন যত হয়, বাল্য-বিবাহ প্রথানুগামী ভারতে তাহার কিছু মাত্রই নাই বলিলেও বলা যায়।

অল্প বয়সে বিবাহে যেমন ভাবী পুত্রকন্যার সবলদেহ প্রবলমনা

হইবার পক্ষে আশঙ্কা থাকে, অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে আবার বর্ত্তমান বালক-বালিকাদের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে যেমন লোক সংসারপালন-ভারাক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধনের সাধ্যমত চেষ্টা করিতে অক্ষম হয় তেমনই আবার অল্প বয়সে বিবাহ না হইলে লোক স্বাধীন থাকিতে পারে বটে কিন্তু আত্মোন্নতির চেষ্টার পক্ষে উত্তেজনাও অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে।

বহুবিবাহ

গুরুদাস বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকের পক্ষে একসময়ে একাধিক পতি প্রায় সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ। পুরুষের পক্ষে এক সময়ে বহুপত্নী খৃষ্টান্ ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ নহে। ইহা ন্যায়তঃ অনুচিত, লোকতঃ নিন্দিত ও কার্য্যতঃ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

বিবাহ পবিত্র অনুষ্ঠান

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ন্যায় গুরুদাস বিবাহ অনুষ্ঠানকে অতি পবিত্র ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—বিবাহ মানব জীবনের প্রধান সংস্কার। ইহাদ্বারা আমরা আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী লাভ করি। বিবাহের দিন মানব জীবনের একটি অতি পবিত্র ও আনন্দের দিন ; সেই দিনের মাহাত্ম্য সমুচিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বিবাহ উৎসব যথাসম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পবিত্র ধর্ম্মকার্য্যে নর্ত্তকীর নৃত্যগীত ও

নটনটীর অভিনয়াদি কোনপ্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদের সংস্রব থাকা অনুচিত।

বিধবা-বিবাহ

গুরুদাস বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—চির-বৈধব্যই বিধবা-জীবনের উচ্চ আদর্শ। পুরুষেরা পত্নীবিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে বলিয়া এই প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। বরং পুরুষেরা যাহাতে সেই উচ্চাদর্শানুসারে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করাই সমাজ-সংস্কারকদিগের উচিত।

এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে, চির-বৈধব্য-পালন উচ্চাদর্শ হইলেও সে আদর্শ অনুসারে সকলে যে চলিতে পারে এরূপ মনে করা যায় না। গুরুদাস লিখিয়াছেন,—বৈধব্য যে দুর্ব্বলদেহধারিণী মানবীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় ক্লেশকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাল-বিধবার ক্লেশ মর্ম্মবিদারক। বিধবাদের ক্লেশে সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হয়। যিনি আধ্যাত্মিক বলে অকাতরে সেই কষ্ট সহ্য করিয়া ধর্ম্মব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহার কার্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। যিনি তাহা করিতে অক্ষম তাঁহার কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, তবে সে কার্য্যের নিন্দা করাও উচিত নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই। এই বিবাহ, হিন্দুশাস্ত্র যাহাই বলুন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধি-বদ্ধ ১৮৫৬ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে সিদ্ধ।

চির-বৈধব্য প্রথার বিরোধীরা বলেন,—ইহা অতি নির্দ্দয় প্রথা। গুরুদাস বলিয়াছেন,—বিধবা যদি কিঞ্চিৎ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া চির-বৈধব্য পালন দ্বারা আত্মোন্নতি ও পরহিতসাধনে সমর্থ হন, তবে সে

কষ্ট তাঁহার কষ্ট নহে এবং যাঁহারা তাঁহাকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে উপদেশ দেন, তাঁহারা তাহার মিত্র ভিন্ন শত্রু নহেন। ব্রহ্মচর্য্য আপাততঃ কঠোর হইলেও বাস্তবিক চির-সুখের আকর। না বুঝিয়া অদূরদর্শীরা ব্রহ্মচর্য্যের নিন্দা করে।

বিরোধীরা বলেন—গুপ্ত-ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি এই প্রথার কুফল। গুরুদাস বলিয়াছেন—এরূপ কুফল যে কখন ফলে না তাহা বলা যায় না। যিনি চির-বৈধব্যপালনে অক্ষম তিনি ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রথা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

বিরোধীরা বলেন—চির-বৈধব্যপালন সামাজিক প্রথা বলিয়া বিধবারা ইচ্ছা হইলেও বিবাহ করিতে চাহেন না, কিংবা মাতাপিতা ইচ্ছামত তাহা-দিগকে বিবাহ দিতে সাহস করেন না। সুতরাং বিধবা-বিবাহই সমাজ-প্রচলিত প্রথা হউক, চির বৈধব্যপালনই ব্যতিক্রম স্বরূপ করা হউক।

গুরুদাস বলিয়াছেন—বিধবারা যখন ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারেন তখন সংস্কারকগণ স্বীকৃত উচ্চাদর্শানুযায়ী প্রথা উঠাইয়া দিয়া কেন বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে চাহেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

জাতিভেদ

গুরুদাস বলিয়াছেন—হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মরক্ষা, উভয়ের অনু-রোধে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা পরিহারপূর্ব্বক উদারভাব ধারণ করা আবশ্যক। বিবাহ ও আহার বাদ রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে নিম্নশ্রেণীয় জাতির সহিত আত্মীয়ভাবে ব্যবহার করা এক্ষণে উচ্চ হিন্দুজাতির

কর্ত্তব্য। মনের ভিতর কাহারও প্রতি কাহারও ঘৃণা বা ঈর্ষা না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আত্মীয়তা সংস্থাপনের কোন বাধা হইতে পারে না।

হিন্দু-মুসলমান

মুসলমানেরা এদেশে অনেক দিন আছেন। প্রথম আগমনকালে এবং তাহার পর কিছুদিন হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের অসদ্ভাব ছিল। কিন্তু সে সকল দিন গিয়াছে। ইদানীং অনেক দিন হইতে পরস্পরের সদ্ভাব হইয়া আসিতেছে, যাহাতে সেই সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

গুরুদাসের উল্লিখিত সামাজিক মতগুলি যাহারা সমর্থন করিতে পারেন না, তাহারাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

সচ্চরিত্র ও মধুরভাষী গুরুদাসের তুল্য অমায়িক সুজন দুর্ল্লভ। তাঁহার ব্যবহারে পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী, প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান, পণ্ডিত মূর্খ সকলে প্রীত হইতেন। গুরুদাস কাহারও মনে বেদনা দিতে জানিতেন না।

এইরূপ কথিত আছে যে, একদা দ্বিপ্রহরে গঙ্গা-স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বলিল—"বাবা, তুমি দেখিতেছি ব্রাহ্মণ, আমার ঘরে নারায়ণ উপবাসী আছেন, আমি আজ বহু সন্ধানেও অভুক্ত ব্রাহ্মণ পাইতেছি না, তুমি কি আমার ঘরে যাইয়া ঠাকুর পূজা করিয়া দিবে?"

গুরুদাস বিনা-বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর অনুরোধ পালন করিয়াছিলেন; বৃদ্ধা না কি পরদিন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি যাঁহার দ্বারা ঠাকুর

পূজা করাইয়াছেন, সেই নিরীহ ব্রাহ্মণ কলিকাতা হাইকোর্টে জজিয়তী করিয়া থাকেন।

উক্ত আখ্যান সত্য কি না নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, সুপণ্ডিত বৃদ্ধ গুরুদাস অল্পবয়স্ক বালকদের আহ্বানে তাহাদের প্রীত্যর্থে বালক-সভায় যোগদানে কদাচ কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

নবম অধ্যায়

—০:*:০—

গুরুদাসের চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগ

দরিদ্র গুরুদাস স্বীয় অধ্যবসায়-বলে বিদ্যা ও পদগৌরব লাভ করিয়া দারিদ্র্য-কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক, কিন্তু এই নিমিত্তই তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন তাহা মনে হয় না। ধার্ম্মিক গুরুদাসের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের শান্তোজ্জ্বল কিরণমালা সকলের হৃদয়রঞ্জন করিয়া থাকে। অনন্য-সুলভ চরিত্রবল-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই তিনি চিরস্মরণীয় হইবেন।

গুরুদাস-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কলিকাতা-নগরস্থ চৈতন্য-লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। গুরুদাসের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"আমি জীবনে এমন সংযমী দ্বিতীয় ব্যক্তি আর প্রত্যক্ষ করি নাই। কোন প্রকার

সুখভোগে গুরুদাসের লালসা ছিল না, বাক্য তাঁহার সংযত ছিল, কোন প্রকার ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমি তাঁহার একজন স্তাবক, একজন ভক্ত। নানা কার্য্যোপলক্ষে আমি প্রায় তিনশতবার তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছি। তাঁহার মুখে কদাচ কাহারও নিন্দা শুনি নাই।"

"আমরা অনেকেই এখন একবেলা অনাহারে অবসন্ন হইয়া পড়ি। সংযমী গুরুদাস স্বল্পাহারী ছিলেন। একবার শারদীয় অবকাশের পরে তিনি আমাদের নিকট গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন—দুই দিন অনাহারের পরে আজ অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ পান করিয়া আমার শরীরটা তাজা হইয়াছে।"

গীতায় যাঁহাদিগকে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, বিগতস্পৃহ, স্থিত-ধী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—গীতার ভক্ত গুরুদাসের জীবনে উহারই পরিচয় দৃষ্ট হইতে পারে। ভোগ-নিস্পৃহ গুরুদাস প্রিয়-পুত্রের মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-সাধনের নিমিত্ত আদালতে গমন করিয়াছিলেন।

গুরুদাসের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-রূপ প্রদীপ-হস্তে বাল্যবয়সেই তিনি যেন জীবন-পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ আলোকে তাঁহার জীবন-বর্ত্ম উদ্ভাসিত ছিল। তিনি বলিয়াছেন ;—

দেহরক্ষা, দার পরিগ্রহ, স্ত্রী-পুত্রাদি পালন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই তাহাতে কোন পাপস্পর্শ না হইবার সম্ভাবনা। জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা ইহাই কেবল ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ইহাই কেবল ধর্ম্মকার্য্য এবং আমাদের অপর কর্ত্তব্যকর্ম্ম কেবল মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য এবং তাহা কেবল লৌকিক বা বৈষয়িক কার্য্য এবং ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সহিত তাহার সংস্রব নাই—এইরূপ মনে করা ভ্রম। যাঁহারা

ঈশ্বর ও পরকাল মানেন তাঁহাদের পক্ষে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া সম্পন্ন করা উচিত।

ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য মানবের সমস্ত কর্ত্তব্যের সমষ্টি। সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশ্যে করণীয়—

যত্ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যত্ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্।

কর্ম্ম বা ভোজন তব, দান বা যজন,
কিংবা তপ, কর সব আমাতে অর্পণ।

এই অর্থেই জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত হিন্দু-জীবনের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত এবং ধর্ম্মকার্য্য স্বরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বরকে ভক্তি করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। উহাকে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যও বলা যায়। উহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। আপনার অভাব ও অপূর্ণতা পূরণের নিমিত্ত মানুষের মনে ব্যাকুলতা রহিয়াছে। বিশ্বের মূলে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণে অভাব ও অপূর্ণতা দূর হইবে এই অস্ফুট জ্ঞান বা বিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া মানুষ সেই অনন্ত শক্তির সহিত মিলিত হইতে চায়। ইহাই ঈশ্বর-ভক্তির মূল।

নিত্য উপাসনা মানবের আর এক কর্ত্তব্য। প্রতিদিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ও সমাপ্ত করিবার পরে অন্ততঃ দুইবার পরমেশ্বরের পূর্ণতা ও পবিত্রতার ছায়া-তলে মন উপস্থাপিত করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের সামীপ্য বোধ জন্মিবে।

আমি ইহা চাহি, তাহা চাহি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা

অকর্ত্তব্য। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই যেন পাই, তাহাই যেন হয়—এই পর্য্যন্ত প্রার্থনাই বিধিসিদ্ধ।

গুরুদাস বলিয়াছেন ;—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস এই দুই বিশ্বাসের মিলনকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

আমি অনন্তকাল থাকিব এবং অনন্ত চৈতন্য-শক্তিদ্বারা চালিত হইব —এই বিশ্বাস থাকিলেই মানুষ জড়-জগৎ ছাড়াইয়া উঠিতে ও সংসারের সুখ-দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে এবং সুখে দুঃখে সমভাবে বলিতে পারে—"যখন অনন্তকাল আমার সম্মুখে এবং অনন্ত চৈতন্য-শক্তি আমার সহায়, তখন অল্প দিনের সুখ-দুঃখ কিছুই নহে—পরিণামে অনন্ত-সুখই আমার প্রাপ্য।"

ঈশ্বর ও পরকাল বোধ হয় জ্ঞানের বিষয় নহে, বিশ্বাসের বিষয়। ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস যুক্তিসিদ্ধ কি না এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে,—সমগ্র বিশ্বের চৈতন্য-শক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া মানা কোন যুক্তির বিরুদ্ধ নহে এবং দেহাবসানেও আমি থাকিব, আত্মার এই উক্তি আত্মজ্ঞানের ফল, ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

গুরুদাস আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক তিনি অপরের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি কদাচ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারেন না। গুরুদাসের মৃত্যুর পরে ১৩২৫ সনের প্রবাসী পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল ;—তিনি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মমতে ও আচারে নিষ্ঠাবান্ থাকিলেও, কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। অনেক শুভ অনুষ্ঠানে তিনি নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত যোগ দিতেন। ধর্ম্মকার্য্য অন্য সম্প্রদায়ের হইলেও তিনি তাহাতে অশ্রদ্ধা দেখাইতেন না। আমাদের মনে পড়ে একবার ব্রাহ্ম-সমাজের মাঘোৎ-সবের নগর-কীর্ত্তন একটি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তখন জজ গুরুদাস

বাবু হাইকোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। কোন কোন বড় মানুষের গাড়ী কীর্ত্তনকারীদের জনতা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। গুরুদাস বাবু নিজ কোচ্‌ম্যানকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার গাড়ী পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, ডাইনে যে রাস্তায় যাইবেন কীর্ত্তনের দল তাহার মোড় অতিক্রম করিয়া যাইবার পর তিনি গৃহাভিমুখে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলেন।

দশম অধ্যায়

গুরুদাসের পরলোকগমন

ইংরাজী ১৯১৮ অব্দের ২রা ডিসেম্বর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেন। দুর্গোৎসবের মহা-অষ্টমী পূজার দিনে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন, উক্ত ব্যাধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ হরণ করে। তাঁহার পরমারাধ্যা জননী সোনামণিও ঐ রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে গুরুদাসের বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তিনি অকালে চলিয়া গিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। তথাপি মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা-নগরে সর্ব্বত্রই লোকের মনে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছিল। ৩রা ডিসেম্বর প্রাতে দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়া সকলে বিষণ্নবদনে বলিতেছিল,—"আহা, এমন মানুষ আর হইবে না।"

তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ কলিকাতা নগরের বিদ্যালয় সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় ইনৃষ্টিটিউট্, রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, এবং অপর বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এই দিন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির

কক্ষে শোকসভায় উকীলদিগের পক্ষ হইতে সরকারী উকীল বাবু শ্যামচরণ মিত্র সি, আই ই, গুরুদাসের জীবন বিবৃত করিয়া বলেন,—এই নগরের জনহিতকর সর্ব্ব প্রকার আন্দোলনের সহিত গুরুদাসের যোগ ছিল। শিক্ষার্থীদিগকে তিনি উচ্চ-নীতি অনুসরণ করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উহা হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না। তাঁহার সহিত যাহার একদিনেরও পরিচয় ছিল, তিনিও তাঁহাকে সম্মান না করিয়া পরিবেন না।

উক্ত সভায় এড্‌ভোকেট জেনারেল মহাশয় বলিয়াছিলেন—আমি স্যর গুরুদাসকে একদিন মাত্র দেখিয়াছি। তখন তিনি এক সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন; আমি তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রাচীন ভারতের সারল্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাঁহার সরল বাক্যাবলী তদীয় হৃদয়ের উদারতা অভিব্যক্ত করিতেছিল। কি ভারতীয়, কি ইয়ুরোপীয় তিনি সকলেরই তুল্যরূপ শ্রদ্ধাভাজন।

গুরুদাস চলিয়া গিয়াছেন, মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের স্থূলদৃষ্টির পরপারে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর স্মৃতিমধ্যে তিনি অমর হইয়া রহিবেন। ব্যবহার-শাস্ত্র, শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার লিখিত যে কয়খানি গ্রন্থ আছে সেই সুলিখিত সুচিন্তিত পুস্তকগুলি এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চিরদিন আদৃত হইবে।

প্রীতির দুশ্ছেদ্য বন্ধনে গুরুদাস যাঁহাদের সহিত যুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু যাহাদিগকে ব্যথা দিয়াছে, তিনি পরলোক হইতে এখনও তাহাদিগকে বলিতেছেন—"আমি মরি নাই, আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও আছি, পরেও থাকিব; আমার আত্মা জরা-ব্যাধিজীর্ণদেহ জীর্ণবস্ত্রবৎ পরিহার করিয়া নববস্ত্রে শোভা পাইতেছে। সুতরাং মৃত্যু যেন তোমাদিগকে ব্যথা প্রদান না করে।"